পঞ্চম অধ্যায়

মাঠ ও উদ্যান ফসল উৎপাদন

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ কাঠালিয়া উপজেলার নিয়ামত তার জমিতে বোরো ধান চাষের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে সে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কেন্দ্রে যায়। বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা তাকে কম খরচে বোরো ধানের অধিক ফলন পেতে পরামর্শ দেন। নিয়ামত উন্নত জাত নির্বাচন, রোপণ সময়, সার ও সেচ প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব দেয়। *◀১ ও ৫ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. রেটুন চাষ কী? ১

খ. কীভাবে অভিজ্ঞ কৃষক থেকে অন্য কৃষকরা তথ্য ও সেবা পায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নিয়ামত উল্লিখিত ফসলটি চাষে যেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয় তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সে প্রতিষ্ঠান কৃষকদের কী ধরনের পরামর্শ ও সহায়তা দিয়ে থাকে— বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথমবার আখ কাটার পর আখের গোড়া থেকে পুনরায় কুশি বের হওয়ার সুযোগ দিয়ে আখ চাষ করাই হলো রেটুন চাষ।

খ যে কৃষক কৃষির সাথে বহুদিন সম্পৃক্ত থাকায় বিভিন্ন কৃষিপ্রযুক্তি মাঠে হাতে-কলমে প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে তাকে অভিজ্ঞ কৃষক বলে।

অভিজ্ঞ কৃষক কৃষিক্ষেত্রের বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কিত অর্জিত জ্ঞান বংশের প্রতিনিধিদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। এছাড়াও গ্রামের অন্য কৃষকরা কৃষির উৎপাদন সংক্রান্ত যেকোনো জটিলতায় অভিজ্ঞ কৃষকের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন। বর্তমানে ফার্মার টু ফার্মার কৃষি সম্প্রসারণ কৌশলের মাধ্যমে অভিজ্ঞ কৃষকের বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত তথ্য ও সেবা অন্য কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

গ নিয়ামত বোরো ধান চাষে উন্নত জাত নির্বাচন, রোপণ সময়, সার ও সেচ প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

নিয়ামত বিভিন্ন ধরনের জমিতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের উন্নত জাত নির্বাচন করে। সে সেচ পানির ঘাটতি এলাকায় আগাম জাত ব্রি ধান-২৮ ও ব্রি ধান-৪৫ চাষ করে। উর্বর জমি ও যেখানে পানি ঘাটতি নেই সেখানে সে ব্রি ধান-২৯, ব্রি হাইব্রিড-১ ও ব্রি হাইব্রিড-২ চাষ করে। এছাড়া জমি অনুসারে জলমগ্নতা সহিষ্ণু বি আর ১৭ (হাসি), বি আর-১৮ (শাহজালাল), বি আর-১৯; শিলাবৃষ্টি প্রবণ এলাকায় বি আর-৮ (আশা) ও বি আর-৯ (সুফলা) এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু ব্রি ধান-৪৭, ব্রি ধান-৬১ চাষ করে। সে উঁচু জমিতে সুগন্ধি ব্রি ধান-৫০ চাষ করে। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বীজতলায় বীজ থেকে চারা উৎপন্ন করে এবং চারার বয়স ৩০-৪৫ দিন হলে চারা রোপণ করে। জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে নিয়ামত হেক্টর প্রতি ৯০ কেজি টিএসপি, ৭০ কেজি এমওপি এবং তিন কিস্তির ১ম কিস্তি ইউরিয়া প্রয়োগ করে। এছাড়া সে জমিতে ৬০ কেজি জিপসাম ও ১০ কেজি জিঙ্ক সালফেট সার প্রয়োগ করে। ধান বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় কিস্তি এবং কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে ৩য় কিস্তি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করে। সে তার জমিতে পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা করে, কারণ বোরো ধান সম্পূর্ণ সেচনির্ভর। মাটির প্রকারভেদে বোরো ধান চাষে ১০০০-১২০০ মিলি পানি প্রয়োজন। জমিতে পানি শুকিয়ে যাওয়ার পর পুনরায় সেচ দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, নিয়ামত বোরো ধান চাষে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তাই সে আশানুরূপ ফলন পায়। এসকল বিষয় না মেনে চললে বোরো ধানের ফলন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

ঘ উদ্দীপকের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে কর্মরত।

BRRI কৃষি গবেষণা হিসেস্টেমের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসেবে ধান উৎপাদন সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উচ্চ ফলনশীল এবং হাইব্রিড জাতের ধান উদ্ভাবন করছে। এছাড়াও মৃত্তিকা, সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা, চাষাবাদ পদ্ধতি, পোকা-মাকড় ও রোগ দমন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মূল্যবান প্রযুক্তি ও কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করছে। এদের উদ্ভাবিত জাতগুলো তুলনামূলকভাবে রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। আবার এসকল জাতের ফলন স্থানীয় জাতের ফলনের তুলনায় অনেক বেশি। উদ্ভাবিত জাতের মধ্যে বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল, সুগন্ধি ও বিদেশে রপ্তানি উপযোগী জাতও রয়েছে। এসকল জাতসমূহ কৃষকদের কাছে সহজলভ্য করে তোলার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে, রয়েছে প্রদর্শনী প্লট ও মডেল কৃষক। এছাড়াও কৃষি তথ্য সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে BRRI পুস্তিকা, ম্যানুয়াল, প্রতিবেদন, জার্নাল প্রভৃতি প্রকাশ করছে। এ প্রতিষ্ঠানটি কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তি প্রদর্শনের জন্য মাঠ দিবসের আয়োজন এবং কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এসকল কার্যক্রমের ফলে কৃষকগণ সহজেই কৃষি সংশ্লিষ্ট তথ্য ও জ্ঞান লাভ করতে পারছে। ফলে কৃষক মাঠ পর্যায়ে

এসব জ্ঞান কাজে লাগিয়ে অল্প খরচে ফসল উৎপাদন করে লাভবান হচ্ছে।

উপরের আলোচনা হতে বলা যায় যে, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষকদের ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সব ধরনের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ২ বুলবুল তার জমিতে আধুনিক পদ্ধতিতে কীভাবে বোরো ধান চাষ করবে সে সম্পর্কে জানার জন্য উপজেলা কৃষি অফিসে গেল। কৃষি কর্মকর্তা তাকে বোরো ধান চাষের জন্য সরাসরি কাদায় বীজ বপনের এবং সবুজ পাতার গাঢ়ত্ব দেখে ইউরিয়ার পরিমাণ নির্ণয়ের সাম্প্রতিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে বললেন। তিনি আরো বললেন, বোরো ধানে পানির চাহিদা বেশি হওয়ায় পূর্ব থেকেই বিল, ডোবা, খাল ও নালায় পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ◀ *২ ও ৫ অধ্যায়ের সমন্বয়ে*

ক. SRI এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. শ্রী পদ্ধতির মাধ্যমে ধান চাষ সুবিধাজনক কেন? ২

গ. বুলবুল তার জমিতে কী ধরনের সাম্প্রতিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কৃষি কর্মকর্তা তাকে কীভাবে পানি সংরক্ষণ করতে বলল- বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SRI এর পূর্ণরূপ হলো System of Rice Intensification।

খ ধান চাষে কম খরচ করে, অতি যত্ন নিয়ে ও কম কৃষি উপকরণ ব্যবহার করে অধিক ধান উৎপাদন পদ্ধতিকে SRI বলে।

শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষে নির্ধারিত সময়ের ১০ দিন আগে ফসল কাটা যায়। ফলন ১৫% পর্যন্ত বাড়ে। সার ও পুষ্টি উপাদান কম লাগে। তাই শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষ সুবিধাজনক।

গ বুলবুল তার বোরো ধানের জমিতে ড্রাম সিডারের সাহায্যে ধান বপন করতে পারে এবং ইউরিয়া সার প্রদান করার জন্য সে এলসিসি ব্যবহার করতে পারে।

ড্রাম সিডারের সাহায্যে কাদামাটিতে সরাসরি অঙ্কুরিত বীজ বপন করা যায়। ড্রাম সিডারের সাহায্যে বীজ বপন করার জন্য প্রথমে আগাছা ও আবর্জনা পচিয়ে জমি সমতল করে ভালোভাবে চাষ দিবে। ড্রামের দুই-তৃতীয়াংশ বীজ দ্বারা পূর্ণ করবে। এক্ষেত্রে অঙ্কুরের দৈর্ঘ্য ৪-৫ মিমি হলে ভালো হয়। ড্রামে ভর্তি করার আগে ছায়াযুক্ত স্থানে ২ ঘন্টা শুকিয়ে বপন করবে। লক্ষ রাখবে যেন জমি সমতল হয় এবং পানি জমে না থাকে। বোরো ধানের জন্য চারা রোপণের ২১ দিন ও বোনা ধানে পাতা বের হওয়ার ২৫ দিন পর কালার চার্ট পাতার মাঝের অংশের উপর রেখে রং মাপবে। রং এর মাত্রার ওপর নির্ভর করে জমিতে কী পরিমাণ ইউরিয়া দিতে হয় তা নির্ধারণ করবে।

অতএব, বুলবুল তার জমিতে উল্লিখিত নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ড্রাম সিডার ও এলসিসি ব্যবহার করতে পারেন যা বর্তমানে সবচেয়ে লাভজনক পদ্ধতি।

ঘ কৃষি কর্মকর্তা বুলবুলকে বোরো মৌসুমে ব্যবহারের জন্য তার এলাকার বিল, ডোবা, খাল ও নালায় পানি সংরক্ষণ করতে বলেন।

বিলে পানি সংরক্ষণ করার জন্য বিল সংলগ্ন নদী খনন করে বিলের পানির অপচয় রোধ করতে হবে। বিলে পানি প্রবেশের পথ যাতে বিঘ্ন না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। ডোবার পানি সংরক্ষণ করার জন্য ডোবার তলার মাটি বেলে প্রকৃতির হলে কর্দম মাটি দিয়ে পানির অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। বাষ্পীভবন বন্ধের জন্য ডোবায় কচুরিপানা ও কলমিলতা জন্মানো যেতে পারে।

নদী থেকে যেখানে খালের সূচনা হয়েছে সেখানে স্লুইস গেট নির্মাণ করতে হবে। বর্ষার শেষে যখন খাল থেকে পানি বের হয়ে নদীর দিকে প্রবাহিত হবে তখন স্লুইস গেট বন্ধ করে দিতে হবে। বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের সময় নালা দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়। বর্ষার মাঝামাঝি পানি হ্রাস হলেই নালার দুই পাশে মাটি দিয়ে সাময়িক বাধ দিয়ে নালায় পানি সংরক্ষণ করা যায়। নালা অগভীর হলে গভীর করেও পানি সংরক্ষণ সম্ভব।

কৃষি কর্মকর্তার উপরিউক্ত বর্ণিত উপায়সমূহ দ্বারা বুলবুল তার জমিতে প্রদানের জন্য পানি সংরক্ষণ করতে পারবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহারও করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ৩ সালাম সাহেব এবার তার কয়েক বিঘা মাঝারি নিচু জমিতে চান্দিনা জাতের ধান আবাদ করেছিলেন। ধানের কাণ্ড, শিকড় ও দানায় বিভিন্ন রোগ আক্রমণ করায় ফলন একদমই পাননি। তাই তিনি একজন কৃষিবিদের কাছে গিয়ে এই সমস্যা যাতে ভবিষ্যতে না হয় তার সমাধান জানতে চাইলেন। ◀ *শিখনফল-১*

ক. আন্তঃপরিচর্যা কী? ১

খ. ধানে সবটুকু ইউরিয়া একসাথে প্রয়োগ করা হয় না কেন? ২

গ. সালাম সাহেব চারা রোপণ করার সময় কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছিলেন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. যেসব পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সালাম সাহেব ভবিষ্যতে এ সমস্যা হতে পরিত্রাণ পাবেন বলে তুমি মনে করো তা লেখো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বীজ বা চারা রোপণের পর থেকে ফসল কাটার পূর্ব পর্যন্ত যেসব পরিচর্যা বা যত্ন নিতে হয় তাকে আন্তঃপরিচর্যা বলে।

খ প্রয়োগকৃত ইউরিয়া সারের বেশিরভাগ অংশই পানি ও বাতাসের সাথে মিশে নষ্ট হয়ে যায় কেননা ইউরিয়া সার গাছ সবটুকু একবারে গ্রহণ করে না।

এ কারনেই ধানের জন্য প্রয়োজনীয় ইউরিয়া সার একবারে প্রয়োগ না করে গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্তরে ২ বা ৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করা হয়।

গ সালাম সাহেব চারা রোপণের সময় কিছু কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তার অবলম্বনকৃত কৌশলগুলো নিম্নরূপ—

বীজতলা থেকে চারা উঠানোর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা মূল জমিতে রোপণ করেছিলেন। সমতল করা জমির উপরে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় চারা রোপণ করেছিলেন। লম্বা দড়ির সাহায্যে সারি সোজা করে চারা রোপণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-২৫ সেমি এবং গুছি থেকে গুছির দূরত্ব

১৫-২০ সেমি রেখেছিলেন। প্রতি গুছিতে ২ থেকে ৩টি সুস্থ সবল চারা রোপণ করেছিলেন। হাতের আঙ্গুল চারার গোড়ার উপর রেখে রোপণ করেছিলেন। মাটির ২-৩ সেমি গভীরে চারা রোপণ করেছিলেন।

সুতরাং, সালাম সাহেব চারা রোপণের উপরিউক্ত কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

ঘ সালাম সাহেবের সমস্যাগুলো হলো ধানের কাণ্ড, শিকড় ও দানা নষ্ট হওয়া।

সালাম সাহেব প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ পদ্ধতিতে এই সমস্যাগুলো থেকে পরিত্রাণ পাবেন। প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপগুলো হলো–

i. রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার।
ii. এগ্রোসান দিয়ে বীজ শোধন।
iii. সুষ্ঠুভাবে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করে রোগের আক্রমণ কমানো।
iv. ইউরিয়া, ফসফেট, পটাশ, জিপসাম ও দস্তাজাতীয় সার সুষমভাবে প্রয়োগ।
v. রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা।
vi. পূর্ব ফসলের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলা।
vii. একই জমি বারবার বীজতলা হিসেবে বা একই জাতের ধান বারবার চাষ না করা।

উপরিউক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে সালাম সাহেব ভবিষ্যতে ধানের বিভিন্ন রোগের প্রকোপ হতে পরিত্রাণ পাবেন।

প্রশ্ন ▶ ৪ নিয়ামত অনেক বছর ধরে বোরো ধানের চাষ করছে। ফলন বৃদ্ধির জন্য সে উন্নত জাত, রোপণ সময়, সার ও সেচের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এতে উৎপাদন খরচ কমে এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। ◀ *শিখনফল-১*

ক. ধান উৎপাদনের মৌসুমগুলোর নাম লেখো। ১
খ. ধান চাষের জমিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করো। ২
গ. নিয়ামত ধান চাষে যে সকল বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে তাদের ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. নিয়ামতের কম খরচে ধানের ফলন বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধান উৎপাদনের ৩টি মৌসুম হলো আউশ, আমন ও বোরো।

খ ভালো ফসল পেতে ধানের জমিতে পরিমিত মাত্রায় ও পদ্ধতিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা হয়।

ধানের চাষ ইউরিয়া সার ৩ কিস্তিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। ১ম কিস্তি জমির শেষ চাষের সময়, ২য় কিস্তি চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এবং শেষ কিস্তি ৪৫-৫০ দিন পর অর্থাৎ কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন আগে প্রয়োগ করতে হয়।

গ নিয়ামত বোরো ধান চাষে উন্নত জাত নির্বাচন, রোপণ সময়, সার ও সেচ প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

নিয়ামত বিভিন্ন ধরনের জমিতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের উন্নত জাত নির্বাচন করে। সে সেচ পানির ঘাটতি এলাকায় আগাম জাত ব্রি ধান-২৮ ও ব্রি ধান-৪৫ চাষ করে। উর্বর জমি ও যেখানে পানি ঘাটতি নেই সেখানে সে ব্রি ধান-২৯, ব্রি হাইব্রিড-১ ও ব্রি হাইব্রিড-২ চাষ করে। এছাড়া জমি অনুসারে জলমগ্নতা সহিষ্ণু বি আর ১৭ (হাসি), বি আর-১৮ (শাহজালাল), বি আর-১৯; শিলাবৃষ্টি প্রবণ এলাকায় বি আর-৮ (আশা) ও বি আর-৯ (সুফলা) এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু ব্রি ধান-৪৭, ব্রিধান-৬১ চাষ করে। সে উঁচু জমিতে সুগন্ধি ব্রি ধান-৫০ চাষ করে। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বীজতলায় বীজ থেকে চারা উৎপন্ন করে এবং চারার বয়স ৩০-৪৫ দিন হলে চারা রোপণ করে। জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে নিয়ামত হেক্টর প্রতি ৯০ কেজি টিএসপি, ৭০ কেজি এমওপি এবং তিন কিস্তির ১ম কিস্তি ইউরিয়া প্রয়োগ করে। এছাড়া সে জমিতে ৬০ কেজি জিপসাম ও ১০ কেজি জিঙ্ক সালফেট সার প্রয়োগ করে। ধান বপনের ২০-২৫ দিন পর ২য় কিস্তি এবং কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে ৩য় কিস্তি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করে। সে তার জমিতে পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা করে, কারণ বোরো ধান সম্পূর্ণ সেচনির্ভর। মাটির প্রকারভেদে বোরো ধান চাষে ১০০০-১২০০ মিলি পানির প্রয়োজন। জমিতে পানি শুকিয়ে যাওয়ার পর পুনরায় সেচ দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, নিয়ামত বোরো ধান চাষে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তাই সে আশানুরূপ ফলন পায়। এসকল বিষয় না মেনে চললে বোরো ধানের ফলন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

ঘ পত্রিকার প্রতিবেদনে কম খরচে বোরো ধানের ফলন বৃদ্ধির জন্য উন্নত জাত, রোপণ সময়, সার ও সেচের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল।

নিয়ামত তার জমির ধরন অনুযায়ী উন্নত জাত নির্বাচন করে। একেকটি জাত একেক ধরনের মাটিতে ভালো ফলন দিয়ে থাকে। সুতরাং ধান বপনের পূর্বে জাতের বৈশিষ্ট্য ও মাটির বুনট অনুযায়ী জাত নির্বাচন করতে হবে। যেমন- লবণাক্ত মাটিতে ব্রি ধান ৪৭, উঁচু জমিতে ব্রি ধান ৫০, নিচু জমিতে বি আর ১৭, বি আর ১৮ ইত্যাদি। বোরো মৌসুমের ধান চাষে সঠিক সময়ে বীজ বপন ও চারা রোপণ আবশ্যক। এ জন্য সে নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যেই বীজতলা প্রস্তুত করে বীজ বপন করে। ফলে সে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে রোপণ উপযুক্ত চারা পায়। সে উপযুক্ত মৌসুমে সঠিক বয়সের চারা রোপণ করতে সক্ষম হয় বলে তার ফলন বৃদ্ধি পায়।

সে সঠিক সময়ে সার ও সেচের ব্যবস্থাও করে। জমিতে সার কম হলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও ফলন হ্রাস পায়। অন্যদিকে জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ বেশি হলে বিষাক্ততা দেখা যায়। গাছ মারাও যেতে পারে। এতে ফলন কমে যায়। অন্যদিকে বোরো ধান সেচ নির্ভর ধান। সুতরাং এ ধানে নিয়ম অনুযায়ী সেচ প্রদান করতে হয়। সে AWD পদ্ধতি অনুসরণ করে সেচ প্রদান করে। ফলে কম খরচে সে পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। এভাবে সে ৩০-৩৫% পানির অপচয় রোধ করে ও উৎপাদন খরচ কমায়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী নিয়ামত বোরো ধান চাষের জন্য উপরের নিয়মগুলো অনুসরণ করেছে। তাই সে কম খরচে ধানের ফলন বৃদ্ধি করতে পেরেছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ করিম ও জব্বার দুজনেই আগাম ধান উঠবে এই চিন্তায় ধানের চারা জুলাই মাসের মাঝামাঝি বপন করেছে। উদ্দেশ্য ধানের পর জমিতে আলু চাষ করবে। করিম আবাদ করেছে ব্রি ধান ৬২ এবং জব্বার আবাদ করেছে ব্রি হাইব্রিড ধান ৪। করিমের ধানে ফুল এলো কার্তিক মাসের মধ্যভাগে এবং জব্বারের ধানে ফুল এসেছে অগ্রহায়ণের প্রথম দিকে। ফলে জব্বার তার জমিতে ধানের পরে বিলম্ব হেতু আলু চাষ করতে পারল না। করিম ঠিক সময়ে জমিতে আলু বীজ বপন করেছে এবং প্রয়োজনীয় ক্রিয়া কর্ম করেছে। ◀ *শিখনফল-১*

ক. কৃষি মৌসুম কী? ১

খ. ফুলকপি কোন ধরনের ফসলের অন্তর্ভুক্ত ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জব্বার এর ধান গাছে বিলম্বে ফুল ধরার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. করিম এর জমিতে ধান ও আলু চাষে সফলতার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব এবং ফসল জন্মানোর সময়ের কথা বিবেচনা করে প্রতি বছরের জন্যে শস্য উৎপাদনের সময়কে বিভিন্ন মৌসুমে ভাগ করাই হলো কৃষি মৌসুম।

খ ফুলকপি উদ্যান ফসলের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল ফসল উদ্যানে বেড়াযুক্ত অবস্থায় নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদন করা হয় তাদের উদ্যান ফসল বলে। উদ্যান ফসল সাধারণত উঁচু ও কম পরিমাণ জমিতে বা বাড়ির আশেপাশে স্বল্প পরিসরে চাষ করা হয়। একত্রে রোপণ করলেও উদ্যান ফসল ধাপে ধাপে পরিপক্ক হয় বলে ধাপে ধাপে সংগ্রহ করতে হয়। ফুলকপিও অল্প পরিমাণ বা বাড়ির আশেপাশে বেড়াযুক্ত অবস্থায় নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদন করা হয় এবং একত্রে পরিপক্ক হয় না বলে ধাপে ধাপে সংগ্রহ করতে হয়। তাই ফুলকপি উদ্যান ফসল।

গ উদ্দীপকে জব্বারের চাষকৃত ব্রি হাইব্রিড ধান ৪ এর গাছে বিলম্বে ফুল এসেছে।

জব্বার যে জাতের উফশী আমন ধানের চারা রোপণ করেছে তার জীবনকাল বেশি। সে হেতু উক্ত জাতের ধানে ফুল এসেছে অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহে। ধানের পরিপক্কতা এসেছে আরও তিন সপ্তাহ পরে। এরপর ধান কেটে নতুন ফসলের জন্য জমি তৈরি করার আর সময় ছিল না। পৌষ মাসের শেষে আলু বীজ বপন করলে তার থেকে ভালো ফলন পাওয়া যায় না। আবার ঐ সময় আলু বীজ বপন করলে গাছে নাবী ধসা রোগ বেশি আক্রমণ করে। জব্বার যে ব্রি হাইব্রিড ধান ৪ এর চারা রোপণ করেছিল তার অঙ্গজ বৃদ্ধি সমাপ্ত হতে দেরি হয়েছে। এ জাতটি দীর্ঘমেয়াদী জাত। তাই গাছে বিলম্বে ফুল ধরেছে।

উপরোক্ত কারণে জব্বারের ধান গাছে বিলম্বে ফুল ধরেছে।

ঘ উদ্দীপকে করিম ধানের পর আলু চাষের উদ্দেশ্যে জমিতে যথাসময়ে ব্রি ধান ৬২ এর চারা রোপণ করে।

করিম স্বল্প জীবনকাল সমৃদ্ধ ব্রি ধান ৬২ জাতের ধানের চারা রোপণ করে প্রয়োজনমতো জমিতে পরিচর্যা করেছে। যথাসময়ে সেচ ও সার প্রদান করেছে। গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি দ্রুত হয়েছে। সেহেতু গাছে কার্তিক মাসের মধ্যভাগে ফুল এসেছে। এর তিন সপ্তাহ পরে পরিপক্ক ধান কাটা হয়েছে। অতঃপর জমি থেকে দ্রুত ধানের খড় অপসারণ করা হয়েছে, জমি শুকিয়ে চাষ দেওয়া হয়েছে। এরপর সঠিক সময়ে সঠিক নিয়মে আলু বীজ বপন করেছে।

করিম কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শমতো ধান ও আলু চাষের সকল কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেছে। করিম খরিপ-২ ও রবি উভয় মৌসুমেই সফলভাবে কৃষি পণ্য উৎপাদন করেছে। তাই সে সফল হলো।

প্রশ্ন ▶ ৬ মফিজ তার জমিতে স্থানীয় জাতের আমন ধান চাষ করেন, যার ফলন বিঘাপ্রতি মাত্র ১০/১২ মণ। অন্যদিকে তার ছোট ভাই ছালাম বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন উফশী জাতের ধানের চাষ করেন, যার ফলন বিঘাপ্রতি ২৫/৩০ মণ। একই রকম পরিচর্যা করা সত্ত্বেও দুজনের জমিতে ফলনে এত কমবেশি হওয়ার কারণ বুঝতে না পেরে মফিজ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার শরণাপন্ন হলেন। কৃষি কর্মকর্তা উভয় জাতের ধানের ফলন পার্থক্যের কারণ মফিজকে বুঝিয়ে দিলেন। ◀ *শিখনফল-১*

ক. উফরা কী? ১

খ. ধানের কাইচ থোড় পর্যায়ে উপরি ইউরিয়া প্রয়োগ করা উচিত নয় কেন? ২

গ. কৃষি কর্মকর্তা উভয় জাতের ধানের ফলন পার্থক্যের যে কারণ জানালেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বর্তমানে খাদ্য চাহিদার প্রেক্ষাপটে ছালামের চাষকৃত জাতের গুরুত্ব উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধানের ছত্রাকজনিত একটি রোগের নাম হলো উফরা।

খ ইউরিয়া সার গাছের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। কাইচ থোড় পর্যায়ে উপরি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা হলে গাছে হঠাৎ করে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখা যায় এবং অতি দ্রুত থোড় পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে। এতে ফলন কমে যায়। এ কারণে কাইচ থোড় পর্যায়ে উপরি ইউরিয়া প্রয়োগ করা উচিত নয়।

গ উদ্দীপকের মফিজ স্থানীয় জাতের আমন ধান এবং ছালাম উফশী জাতের ধান চাষ করেন।

মফিজ ও ছালাম তাদের ধান ফসলে একই রকম পরিচর্যা গ্রহণ করলেও ফলন একই রকম হয় না। পরবর্তীতে কৃষি কর্মকর্তা তাদের ধানের ফলনের পার্থক্যের কারণ বলেন। তিনি বলেন, যে ধান গাছের সার গ্রহণ ক্ষমতা অধিক ও ফলন বেশি তাকেই উফশী ধান বলে। এ ধানের গাছে কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। যেমন- গাছ মজবুত, পাতা খাড়া এবং ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে। ফলে অনেকদিন সালোকসংশ্লেষণ চলতে থাকে, যা খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করে। অপরদিকে স্থানীয় জাতের গাছ দুর্বল প্রকৃতির, পাতা হেলে পড়ে, সার গ্রহণ ক্ষমতা কম এবং ধান পাকার সাথে সাথে গাছ শুকিয়ে যায়। সঙ্গত কারণেই ফলনও কম হয়।

অতএব বলা যায়, কৃষি কর্মকর্তা মফিজ ও ছালামের ধানের ফলন পার্থক্যের সঠিক কারণ উল্লেখ করেন।

ঘ স্থানীয় ও উফশী ধানের জাতের মধ্যে উফশী ধানের চাষে অধিক ফলন পাওয়া যায়।

উফশী ধানের ক্ষেত্রে ধান গাছ রোগ, পোকা, খরা, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ইত্যাদি প্রতিরোধী হয়। এছাড়া এ জাতের ধানের সার গ্রহণ ক্ষমতা অধিক। এ ধানে দানা ও খড়ের অনুপাত ১ ঃ ১ হয়। ফলে এ ধানের ফলন স্থানীয় জাতের তুলনায় অনেক বেশি হয়। এ ধানের চাষ পদ্ধতিও সহজ যা স্থানীয় জাতের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।

বর্তমানে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে কিন্তু কৃষি জমি বাড়ছে না। কিন্তু খাদ্য চাহিদা ঠিকই বাড়ছে। অন্যদিকে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অতিরিক্ত বসতবাড়ির জন্য আবাদি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। স্বল্প আবাদি জমিকে কাজে লাগিয়ে অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতের উফশী ধান উদ্ভাবন করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান খাদ্য চাহিদার প্রেক্ষাপটে উফশী জাতের ধান চাষের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৭

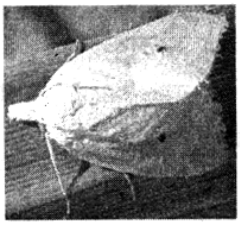

ক

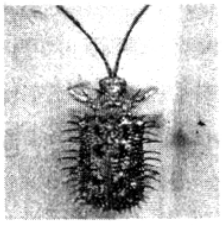

খ

◀ *শিখনফল-১*

ক. ধানের বৈজ্ঞানিক নাম লেখো। ১

খ. উফশী ও হাইব্রিড জাতের ধানের দুটি পার্থক্য লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র-ক ও চিত্র-খ এর পোকা দ্বারা আক্রান্ত ধানের ক্ষতিকর লক্ষণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ধানের ক্ষেত্রে চিত্র 'ক' পোকার দমন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধানের বৈজ্ঞানিক নাম হলো– *Oryza sativa.*

খ উফশী ও হাইব্রিড জাতের ধানের মধ্যে দুটি পার্থক্য নিচে উল্লেখ করা হলো–

উফশী ধান	হাইব্রিড ধান
i. এক জাতের সাথে অন্য জাতের একাধিকবার সংকরায়ণ করে উদ্ভাবন করা হয়।	i. এক জাতের সাথে অন্য জাতের একবার সংকরায়ণ করে উদ্ভাবন করা হয়।
ii. ফসলের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য অনেক দিন অক্ষুণ্ন থাকে।	ii. ফসলের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে।

গ উদ্দীপকের চিত্র-ক এ উল্লিখিত পোকাটি হলো মাজরা পোকা এবং চিত্র-খ এ উল্লিখিত পোকাটি হলো পামরি পোকা। এ দুটি পোকা দ্বারা আক্রান্ত ধানের লক্ষণ নিচে উল্লেখ করা হলো–

(ক) মাজরা পোকা: মাজরা পোকার স্ত্রী মথ ধানগাছের পাতার আগার দিকে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে কীড়া বের হওয়ার পর কীড়াগুলো কাণ্ডের ভিতরে ঢুকে কাণ্ডের নিচের দিক কেটে দেয়। গাছের শিষ আসার পূর্বে আক্রমণ করলে 'মরা ডগা' এবং শিষ আসার সময় আক্রমণ করলে 'সাদা শিষ' বের হয়ে আসে।

(খ) পামরি পোকা: পূর্ণ বয়স্ক পামরি পোকার গায়ের রং চকচকে কালো এবং পিঠের উপর অসংখ্য কাঁটা আছে। বয়স্ক পোকা এবং কীড়া উভয়ই ধানগাছে আক্রমণ করে। পূর্ণ বয়স্ক পোকা ধানের পাতার উপর সমান্তরাল দাগ করে সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। কীড়া পাতার দু'স্তরের ভিতরে সুড়ঙ্গ তৈরি করে খায়। পরবর্তীতে গাছ পুড়ে যাওয়ার মতো রং ধারণ করে মরে যায়, একে হপার বার্ন (Hopper burn) বলে।

ঘ তৈরি চিত্র-ক এর পোকাটি হলো মাজরা পোকা। এ পোকার দমন পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো–

ধান ক্ষেত মাজরা পোকা দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রথমে ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলতে হবে। তারপর আলোক ফাঁদের সাহায্যে মথ সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে। জমিতে ডালপালা পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পাখি পোকা খেতে পারে। এছাড়া জমিতে ১০-১৫% মরা ডগা অথবা ৫% সাদা শীষ দেখা গেলে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া ধান কাটার পর চাষ দিয়ে নাড়া মাটিতে মিশিয়ে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

এভাবে পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করে ধান ক্ষেত থেকে মাজরা পোকা দমন করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৮ জহির আব্বাস হেলাই গ্রামের একজন আদর্শ কৃষক। এ বছর তিনি তার আবাদি জমির অর্ধেকে ডাল জাতীয় ফসলের চাষ করবেন বলে ঠিক করেছেন। তাই তিনি বর্ষজীবী বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ যার কান্ড বর্গাকার, উচ্চতা ৪০ সেমি পর্যন্ত, জীবনকাল প্রায় ১২০ দিন, ফল চ্যাপ্টা ও চওড়া এরূপ ডাল জাতীয় ফসলের চাষ করেন। এক্ষেত্রে তিনি উন্নত জাত, জমি নির্বাচন, জমি প্রস্তুত, বীজ বপনের নিয়ম, আন্তঃপরিচর্যা, রোগ ও পোকামাকড় দমন, ফল সংগ্রহ, মাড়াই ও সংরক্ষণ সকল কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন। ◀ *শিখনফল-২*

ক. কোন জলবায়ুতে ধানের চাষ ভালো হয়? ১

খ. দানা জাতীয় ফসলের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ২

গ. উদ্দীপকে জহির আব্বাসের চাষকৃত ডাল জাতীয় ফসলের পরিচয় ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কী মনে করো জহির আব্বাস উক্ত ডাল জাতীয় ফসলের চাষ পদ্ধতিতে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাবে? মতামত দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অব-উষ্ণ ও উষ্ণ-নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ধানের চাষ ভালো হয়।

খ দানাজাতীয় ফসলগুলো Gramineae পরিবারভুক্ত।

দানা জাতীয় ফসলের বৈশিষ্ট্য হলো– i. শস্য দানা বা বীজ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ii. মাঠে চাষ করে প্রচুর পরিমাণে জন্মানো যায়। iii. সারা বছর জন্মানোর জাত পাওয়া যায়। iv. অধিকাংশই একবীজপত্রী উদ্ভিদ। v. এদের দানায় প্রচুর শর্করা থাকে। vi. এরা বর্ষজীবী বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। vii. এদের ফুলে স্বপরাগায়ন ঘটে ৯৫% এবং পরপরাগায়ন ঘটে ৫%।

গ উদ্দীপকের জহির আব্বাস তার জমির অর্ধেকে ডাল জাতীয় ফসল মসুর চাষ করেন।

জহির আব্বাসের চাষকৃত ডাল বর্ষজীবী বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। এর গাছ অনেক শাখা-প্রশাখাযুক্ত, কাণ্ড বর্গাকার, উচ্চতা ৪০ সেমি পর্যন্ত এবং জীবনকাল প্রায় ১২০ দিন। এর ফল চ্যাপ্টা ও চওড়া। সুতরাং এটি মসুর ডাল। মসুর অন্যতম ডালজাতীয় ফসল। মসুর বাংলাদেশের সুস্বাদু ও জনপ্রিয় দানাশস্য। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, এলাকা ও উৎপাদনের বিচারে মসুর ডাল দ্বিতীয় অবস্থানে থাকলেও ব্যবহারের বিবেচনায় এটি প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। দেশের প্রায় সর্বত্র মসুর ডালের চাষাবাদ হয়ে থাকে। মসুরের ডাল স্যুপ হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। মসুর ডালের কাঁচা ফল সবজি হিসেবে খাওয়া যায়। তাছাড়া গরু, মহিষের জন্য মসুরের গাছ অত্যন্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য।

মসুর ডালের পুষ্টিগুণ বিচার করে একে "গরিবের মাংস" বলা হয়। এ ফসলের উৎপাদন বাড়ালে আমিষের চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে।

ঘ উদ্দীপকে জহির আব্বাস তার আবাদি জমিতে মসুর ডালের চাষ করেন।

জহির আব্বাস মসুর চাষের জন্য বিএআরআই উদ্ভাবিত উন্নত জাতের মসুর ডাল ব্যবহার করেন। মসুর চাষের জন্য উর্বর দোঁআশ মাটি নির্বাচন করেন। ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করার পর জমি তৈরি করেন। এক্ষেত্রে জমি উত্তমরূপে মাটি গুঁড়ো করে তৈরি করেন। কারণ মাটি উত্তমভাবে কর্ষিত না হলে শস্যের ফলন ভালো হয় না। তিনি অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মসুরের বীজ বপন করেন। তিনি পুষ্ট, পরিষ্কার, নীরোগ বীজ সারিতে বপনের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৮-১০ সেমি রাখেন, চারা গজানোর পর জমির আগাছা নিড়ানি দিয়ে পরিষ্কার করেন। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে যাতে পানি না জমে সেজন্য তিনি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করেন।

তিনি মসুর ক্ষেতের মাজরা পোকা ও জাব পোকা দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম ডিটারজেন্ট মিশিয়ে স্প্রে করেন। তিনি গোড়া পচা রোগ দমনের জন্য ভিটাভেক্স ২০০ দিয়ে বীজ শোধন করেন। তিনি গাছগুলো ভালোভাবে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরু দিয়ে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করেন। বীজ সংরক্ষণ করার জন্য ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে আলকাতরার প্রলেপ দেয়া মাটির পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করেন।

তাই বলা যায়, জহির সাহেব সঠিকভাবে ডাল চাষের সকল কাজ সম্পাদন করায় তিনি মসুর ডালে কাঙ্ক্ষিত ফলন লাভ করবেন বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৯ সিরাজগঞ্জের সামছুল ও আলম নতুন জমিতে মসুর চাষ করেন। সামছুল তার জমিতে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি ও অণুজীব সার ব্যবহার করেন। আলম তার জমিতে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সার ব্যবহার করেন। মসুর চাষের অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যায় উভয়েই ছিলেন যত্নবান কিন্তু ফলন পেলেন তারা যথাক্রমে ১.৬ টন/হেক্টর ও ১.১ টন/হেক্টর।

◀ *শিখনফল-২*

ক. জীবাণু সার কী? ১

খ. বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জনাব সামছুলের বেশি ফলন প্রাপ্তির রহস্য বর্ণনা করো। ৩

ঘ. কাঙ্ক্ষিত ফলন প্রাপ্তির জন্য জনাব আলমের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল জীবাণু মাটিতে প্রয়োগ করার পর তা মাটির জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া তরান্বিত করার মাধ্যমে মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ ও উদ্ভিদকে পুষ্টি দ্রব্য সরবরাহ করে সেগুলোকে জীবাণু সার বলে।

খ মাঠ থেকে সংগৃহীত বা প্রক্রিয়াজাতকৃত বীজ বপনের পূর্ব পর্যন্ত গুদামজাত করে রাখাকে বীজ সংরক্ষণ বলে।

বীজ উৎপাদনের পর সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হলে বীজের গুণাগুণ ভালো থাকে। বীজ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন- তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই বীজ সংরক্ষণ, আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বীজ সংরক্ষণ এবং তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে হিমাগারে বীজ সংরক্ষণ। সাধারণত প্রথম ২টি উপায়ে মাঠ ফসলের বীজ ও শেষোক্ত উপায়ে উদ্যান ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা হয়।

গ জনাব সামছুল তার মসুর ডাল চাষের জমিতে অন্যান্য সারের সাথে অণুজীব সারও ব্যবহার করেন যা তার বেশি ফলন লাভের কারণ।

জনাব সামছুল তার মসুর ডাল চাষের জমিতে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি এর পাশাপাশি অণুজীব সার ব্যবহার করেন। অণুজীব সারের ব্যাকটেরিয়াসমূহ বাতাসের নাইট্রোজেন মাটিতে সংবন্ধন করে। এতে মাটির উর্বরতা বাড়ে ও গাছ মাটি থেকে নাইট্রোজেন সহজে গ্রহণ করে বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে। ডাল জাতীয় ফসলের জমিতে অণুজীব সার ব্যবহার করলে ফলন বৃদ্ধি পায়। অণুজীব সার ফসলকে কিছু মাটিবাহিত রোগের আক্রমণ থেকেও রক্ষা করে। তাছাড়া এসব জমিতে উৎপাদিত ফসল তুলনামূলকভাবে খরা সহনশীল হয়। অণুজীব সার মাটিতে নাইট্রোজেন যোগ ও ফসফেট দ্রবীভূত করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ করে, এতে মাটির দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য রক্ষা হয় ও অণুজীব সার ব্যবহারে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাবও পড়ে না। রাসায়নিক সারের তুলনায় অণুজীব সার সস্তা। এই সার ব্যবহারে ইউরিয়া ও টিএসপি সার কম লাগে।

উপরের আলোচনা হতে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, জনাব সামছুলের জমিতে অণুজীব সার ব্যবহারের ফলেই ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ জনাব আলম তার মসুর ডাল চাষের জমিতে উপযুক্ত পরিচর্যার পরেও কম ফলন পান।

জনাব আলম তার মসুর ডাল চাষের জমিতে শুধু ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সার প্রয়োগ করেন। কিন্তু তিনি কোনো অণুজীব সার প্রয়োগ করেন নি। বহুদিন থেকে উক্ত জমিতে বারবার চাষ করার জন্য জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে বারবার অধিক পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহারের কারণে জমিতে বিষাক্ততাও দেখা দিয়েছে।

জনাব আলম তার জমিতে ফলন বৃদ্ধির জন্য জৈব সার ও অণুজীব সার ব্যবহার করতে পারেন। জৈব সার যেমন– সবুজ সার, কম্পোস্ট ইত্যাদি ব্যবহার করলে তার জমির মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়বে। এভাবে প্রতি বছর সবুজ সার প্রয়োগে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাবে। তিনি ডাল জাতীয় ফসলের সাথে অণুজীব সার চাষ করতে পারেন। অণুজীব সারে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকে। ফলে রাসায়নিক সার কম প্রয়োগ করতে হয়। এই সার মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা ও মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ উন্নত করে। অণুজীব সার প্রয়োগে ফসলে পোকামাকড়ের আক্রমণ ও রোগ কম হয়।

সুতরাং, জৈব ও অণুজীব সার ব্যবহারের মাধ্যমে জনাব আলম তার জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করতে পারবেন। এতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমে উৎপাদন খরচ কমে যাবে।

প্রশ্ন ▶১০ কৃষক মান্নান প্রায় সব ধরনের ডালই চাষ করে থাকেন। এবার তিনি তার জমিতে কান্তি, প্রগতি বা রূপসা জাতের যেকোনো একটি চাষ করে ভালোভাবে ফসল ঘরে তুলতে চান।

◀ *শিখনফল-২*

ক. ফাজ কী? ১

খ. ধানের চারা রোপণের ২ সপ্তাহ পর্যন্ত মাটি ভেজা রাখতে হয় কেন? ২

গ. মান্নান সাহেবকে সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কী করতে হবে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উক্ত ফসল আবাদের জন্য কী ধরনের মাটি ও জলবায়ু হওয়া প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জিনিং করে বীজতলা থেকে আঁশ বা লিন্ট ছাড়ানোর পর বীজের গায়ে যে ছোট ছোট আঁশ লেগে থাকে তাকে ফাজ বলে।

খ বীজতলা থেকে চারা উঠানোর পর সমতল করা জমির উপরে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় চারা রোপন করা হয়। চারা রোপণের পর মাটি ভেজা থাকলে চারার শিকড় ও কুশির বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। এ কারণেই চারা রোপণের ২ সপ্তাহ পর্যন্ত মাটি ভেজা রাখা উচিত।

গ ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সার প্রয়োগ করা জরুরি, এতে ফসল প্রয়োজনীয় উপাদান খুব সহজে সংগ্রহ করতে পারে।

ভালো ফসল পেতে মান্নান সাহেব প্রতি হেক্টরে ইউরিয়া ৪০-৫০ কেজি, টিএসপি ৮০-৮৫ কেজি, এমওপি ৩০-৩৫ কেজি, গোবর সার ১৫০ মণ এবং অণুজীব সার ৪-৫ কেজি প্রয়োগ করবেন। শেষ চাষের সময় সব সার প্রয়োগ করতে হবে। অপ্রচলিত এলাকায় আবাদের জন্য সুনির্দিষ্ট অণুজীব সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে প্রতি কেজি বীজের জন্য ৫০ গ্রাম অণুজীব সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। সাধারণত অণুজীব সার ব্যবহার করলে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করার তেমন দরকার হয় না।

মান্নান সাহেবকে উল্লিখিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। এতে তিনি ভালো ফলন পাবেন।

ঘ প্রত্যেকটি ফসল চাষের জন্য উপযুক্ত জলবায়ু ও মাটির প্রয়োজন।

অনেক ধরনের মাটিতেই মুগ চাষ করা যায়। কিছুটা বেলে মাটি, দোআঁশ মাটি, এমনকি এঁটেল মাটিতেও মুগের চাষ করা যেতে পারে। মুগ পানি জমে থাকাটা সহ্য করতে পারে না। এ কারণে মুগের জন্য সবচেয়ে ভালো জমি হলো একটু উঁচু পলিমাটি বা দোআঁশ মাটি যেখানে পানি জমে থাকে না। কিছুটা লোনা মাটিতেও মুগ জন্মাতে পারে। পানি নিষ্কাশনের সুবিধা নেই এমন এঁটেল মাটিতে মুগ ভালো হয় না।

মুগ একটি উষ্ণ আবহাওয়ার ফসল। মুগ ফসলের জন্য অনুকূল তাপমাত্রা ৩০-৩৫° সেন্টিগ্রেড। বাতাসের তাপমাত্রা মোটামুটি ৪০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত সহ্য করতে পারে। ঠান্ডা আবহাওয়া মুগ সহ্য করতে পারে না। মুগ বেশ খরা সহিষ্ণু ফসল। মাটির pH ৬.২ থেকে ৭.২ এর মধ্যে এ ফসলটির উৎপাদন ভালো হয়।

সুতরাং, মুগ চাষের জন্য উপরোক্ত ধরনের মাটি ও জলবায়ু প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶১১ সফিকুল মসুর ডাল চাষের জন্য জমি তৈরি করেন। তিনি মাটি ও ফসল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মুগ ডালের ফলন বাড়াতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এমতাবস্থায় মাটি পরীক্ষা করে জমিতে জীবাণু সারসহ রাসায়নিক সার মসুর ডাল চাষের জন্য প্রয়োগ করেন।

◀ *শিখনফল-২*

ক. জীবাণু সার কী? ১

খ. জীবাণু সার ব্যবহারে রাসায়নিক সার কম লাগে কেন? ২

গ. সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা কী? সফিকুল প্রতি শতক জমিতে কী পরিমাণ সার ব্যবহার করবেন? ৩

ঘ. মসুর ডালের ফলন বৃদ্ধিতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়– আলোচনা করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল জীবাণু মাটিতে প্রয়োগ করার পর তা মাটির জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া তরান্বিত করার মাধ্যমে মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ ও উদ্ভিদকে পুষ্টি দ্রব্য সরবরাহ করে সেগুলোকে জীবাণু সার বলে।

খ জীবাণু সার মাটিতে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান যোগ করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী জীবাণু সার মাটিতে ও ফসলে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে ফসলের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে এবং মাটির উর্বরতা বাড়ায়। ফসফেট ঘটিত জীবাণু সার ব্যবহার করলে তা মাটিস্থ অদ্রবণীয় ফসফেট দ্রবীভূত করে ফসলের জন্য গ্রহণযোগ্য করে তোলে। শিম ও ডালজাতীয় শস্যে জীবাণু সার ব্যবহারে নাইট্রোজেনঘটিত রাসায়নিক সার কম লাগে। ফলে জীবাণু সার ব্যবহারে রাসায়নিক সারের সাশ্রয় হয়।

গ সার প্রয়োগের ফলে অনুর্বর জমি উর্বর হয়, এ কারণে সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

জমিতে নাইট্রোজেনের অভাব থাকলে ইউরিয়া সার, গন্ধক ও দস্তার অভাব মেটানোর জন্য জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট সার প্রয়োগ করতে হয়। জৈব সার যেমন- কম্পোস্ট সার, সবুজ সার, অণুজীব সার প্রয়োগের ফলে মাটিতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান যুক্ত হয়। এছাড়াও মাটির গঠন ও বুনটের উন্নয়ন করে। ফলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ও বায়ু চলাচল বাড়ে। এভাবে সার মাটিকে ফসল উৎপাদনের উপযোগী করে তোলে। সফিকুল মসুর ডাল চাষের জন্য জমি তৈরি করেন। তিনি প্রতি শতক জমিতে ১৮২ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০৩ গ্রাম টিএসপি, ১৪২ গ্রাম এমওপি, ২১ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করবেন। তিনি যদি ১২ গ্রাম অণুজীব সার জমিতে ব্যবহার করেন তবে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করবেন না। তিনি অণুজীব সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বীজের সাথে মিশিয়ে জমিতে প্রয়োগ করবেন ।

উপরিউক্ত পরিমাণের সার সফিকুল তার মসুর ডালের জমিতে প্রয়োগ করবেন। এতে তার ফসলের ভালোভাবে বেড়ে ওঠার জন্য সকল পুষ্টি উপাদানের সরবরাহ নিশ্চিত হবে।

ঘ উদ্দীপকের সফিকুল তার জমিতে মসুর ডালের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

মসুর ডালের ফলন বৃদ্ধিতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। সুনিষ্কাশিত দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ মাটি মসুর চাষের জন্য বেশ উপযোগী। তাই এই ধরনের জমি নির্বাচন করতে হবে। উচ্চ ফলনের জন্য বারি মসুর-৩, বারি মসুর-৪ ও বিনা মসুর-২ জাত নির্বাচন করা যায়। মসুর চাষের জন্য জমিতে ২-৩টি চাষ ও উত্তমরূপে মই দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে জমি তৈরি করতে হবে। কার্তিক মাসের ২য় সপ্তাহ থেকে ৩য় সপ্তাহ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত) বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। বীজ ছিটিয়ে অথবা সারিতে বপনের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০ সেমি রাখতে হবে। সারিতে হেক্টর প্রতি ৩০-৩৫ কেজি বীজ এবং ছিটিয়ে বপন করার ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ৩৫-৪০ কেজি বীজ বপন করতে হয়। জমি তৈরির চূড়ান্ত পর্যায়ে সুপারিশকৃত সমুদয় সার ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য চারা গজানোর পর জমিতে আগাছা দেখা দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। বিভিন্ন রোগজীবাণু দমনের জন্য রোগ সহনশীল জাতের মসুর চাষ করতে হয়। বিভিন্ন পোকা দমনের জন্য কীটনাশক পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। মধ্য ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র (মার্চ) মাসে মসুর ডাল সংগ্রহ করতে হয়। অতএব, উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো নিলে মসুর ডালের ফলন বৃদ্ধিতে তা সহায়ক ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶১২ উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ডাল

i. ডালজাতীয় ফসলের মধ্যে প্রধান

ii. ডালজাতীয় ফসলের মধ্যে দ্বিতীয়

ক. ডাল কী জাতীয় ফসল? ১

খ. ডাল জাতীয় ফসলের বৈশিষ্ট্য লেখো। ২

গ. i. নং এ উল্লিখিত ফসলের বিভিন্ন জাতের ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. ii. নং এ উল্লিখিত ফসলের ৩টি পোকার বিবরণ ও দমন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ডাল লিগিউম জাতীয় ফসল।

খ শিম জাতীয় যেসব মাঠ ফসলের বীজ ডাল খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাকে ডাল জাতীয় ফসল বলে।

ডাল জাতীয় ফসলের বৈশিষ্ট্য হলো—

i. ডালজাতীয় ফসলে ২০-৩০% আমিষ থাকে যা প্রাণিজ আমিষের চেয়ে বেশি।

ii. যে কোনো উর্বরতার মাটিতে ভালো হয়।

iii. এটি মাটিতে নাইট্রোজেন সংযোজন করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

iv. এটি সুস্বাদু ও সুপাচ্য।

গ উদ্দীপকের i. নং এ উল্লিখিত ফসলটি হলো মসুর। এর বিভিন্ন জাতের বর্ণনা নিম্নে ছক আকারে দেওয়া হলো:

জাত	ফলন (টন/হেক্টর)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বিনামসুর-১	১.৮	১৩০-১৩৫	উফশী জাত, বীজ কালো, ব্লাস্ট প্রতিরোধী।
বিনামসুর-২	১.৯	৯৮-১০১	আগাম পাকে, ফুল সাদা, আমিষের পরিমাণ ২৫.৯%।
বিনামসুর-৩	১.৮	৯৫-১০৫	আগাম পাকে, কাণ্ডের রঙ লালচে, পাতার রঙ হালকা সবুজ।
বিনামসুর-৪	২.০	৯৫-১০৫	হালকা সবুজ, ফুল সাদা, আমিষের পরিমাণ ২৫%।
বিনামসুর-৫	২.২	৯৫-১০৪	আগাম পাকে, উচ্চ ফলনশীল, বীজ আকারে বড়।
বিনামসুর-৬	২.০	১০৫-১১০	উচ্চ ফলনশীল, আমিষের পরিমাণ অনেক বেশি।
বারিমসুর-১	১.৮	১০৫-১১০	কাণ্ড হালকা সবুজ, ফুল সাদা, কিছুটা লতানো।
বারিমসুর-২	১.৯	১০৫-১১০	পাতা গাঢ় সবুজ, ফুল সাদা।
বারিমসুর-৩	২.০	১০০-১০৫	বীজের রঙ ধূসর, ফুল সাদা, পাতা সবুজ।
বারিমসুর-৪	২.০	১১০-১১৫	মরিচা ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধী, বীজ লালচে বাদামি।

জাত	ফলন (টন/হেক্টর)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারিমসুর-৫	২.০	১১০-১১৫	পাতা ও গাছের রঙ সবুজ, বীজের আকার বড় ও চ্যাপ্টা।
বারিমসুর-৬	২.২	১০৫-১১০	বীজের আকার বড় ও চ্যাপ্টা, রঙ গাঢ় বাদামি।
বারিমসুর-৭	২.০	১০০-১০৫	গাছের উচ্চতা ৩২-৩৮ সেমি, ১০০০ বীজের ওজন ২৩.০-২৫.০ গ্রাম।

উপরিউক্ত জাতগুলো মসুর ডালের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় এবং এই জাতগুলোর উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকের ii. নং এ উল্লিখিত ফসলের নাম হলো মুগ। যার ৩টি পোকার বিবরণ ও দমন ব্যবস্থা নিম্নে দেওয়া হলো—

মুগ ডালে বিছা পোকা আক্রমণ করে থাকে। পূর্ণবয়স্ক মথ মাঝারি আকৃতির, ঈষৎ পীত বর্ণের এবং সামনের পাখায় কালো দাগ আছে। পূর্ণাঙ্গ শূককীটের গায়ে অসংখ্য লোম থাকায় এরা বিছা বা শুয়োপোকা নামে পরিচিত। বিছা পোকা ৫ বার খোলস বদলায়। একেক বার খোলস বদলানোর পর তাদের আকারও বড় হয়। পরজীবী পোকা *Adanteles obliquae* এবং পলিহেড্রাল ভাইরাস দিয়ে এই পোকা দমন করা যায়। নিম, ধুতুরা, বিষকাটালি প্রভৃতির রস প্রথম-তৃতীয় স্তরের বিছা পোকার উপর ছিটিয়ে ৩০ থেকে ৪০ ভাগ দমন করা যায়। এছাড়া ডায়াজিনন ৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মিলি ওষুধ মিশিয়ে ছিটিয়ে দিলে এ পোকা দমন করা যায়।

অন্য দুইটি পোকার একটি হলো শুঁটি ছেদক পোকা ও জ্যাসিড পোকা। শুঁটি পোকা গাছের পাতা, শুঁটি, ফুলের কুঁড়ি ছিদ্র করে এবং একত্র করে জালের সাহায্যে আবদ্ধ করে। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী মথ ফুলের কুঁড়ি, ফুল ও শুঁটির উপর একটি করে ডিম পাড়ে। এই পোকার দমন ব্যবস্থা হিসেবে একই জমিতে সারা বছর ডাল জাতীয় ফসল চাষ করা যাবে না, ফলে পোকার জীবনচক্র বাধাপ্রাপ্ত হবে। পোকা প্রতিরোধী জাত বপন করতে হবে। সুমিথিয়ন ৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। অন্যদিকে জ্যাসিড পোকা হালকা সবুজ রংয়ের এবং আকৃতিতে ছোট। এ পোকা পাতার রস চুষে খেয়ে ফেলে। এ পোকা দমনে সাইপারমেথ্রিন ১ মিলি/লি. পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হয়।

অতএব বলা যায়, মুগ ফসলের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত পোকাগুলোর বিবরণ থেকে সঠিক দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১৩ উজিরপুর এলাকার কৃষক আব্বাস তার ১ বিঘা জমিতে কী আবাদ করবেন ঠিক না করতে পেরে কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করলেন। কৃষি কর্মকর্তা তাকে ডাল জাতীয় ফসল চাষের পরামর্শ দিলেন। ◀ *শিখনফল-২*

ক. সমভাবাপন্ন জলবায়ু কী? ১

খ. উদ্যান ফসল চাষ করা লাভজনক কেন? ২

গ. কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শকৃত ফসলের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শকৃত ফসলের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে জলবায়ুতে গ্রীষ্ম ও শীতের কোনো তীব্রতা থাকে তাই সমভাবাপন্ন জলবায়ু।

খ যে সকল ফসল উদ্যানে বেড়াযুক্ত অবস্থায় নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদন করা হয় তাদের উদ্যান ফসল বলে।

উদ্যান ফসলের পুষ্টিমান বেশি এবং সহজেই খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বেশিরভাগ উদ্যান ফসল একবার দানা ফসল উৎপাদনের সময়কালে ২-৩ বার উৎপাদন করা যায়। উৎপাদনের দিক বিবেচনা করা হলে একক পরিমাণ জমিতে দানা ফসলের তুলনায় বেশি ফলন দেয়। এ কারণেই উদ্যান ফসল চাষ করা বেশ লাভজনক।

গ কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শকৃত ফসল হলো ডাল জাতীয় ফসল। নিচে এ জাতীয় ফসলের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো—

i. ডাল লিগিউম জাতীয় ফসল। এরা পড বা শুটি উৎপাদন করে।

ii. শিকড়ে রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া গুটি তৈরি করে। এই রাইজোবিয়াম বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংযোজন করে গুঁটিতে জমা রাখে।

iii. একবর্ষজীবী, বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। অধিকাংশেরই ফুলের রং সাদা। ফুল উভলিঙ্গ ও স্বপরাগী।

iv. ফসল কিছুটা খরাসহিষ্ণু, ফসল তাপমাত্রায় স্পর্শকাতর। বিনা চাষেও আবাদ করা যায়।

v. কম উর্বর জমিতেও চাষ করা যায়। এরা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। পরিচর্যা কম লাগে। গোখাদ্য হিসেবেও চাষ করা হয়।

ঘ কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শকৃত ডাল জাতীয় ফসল সামগ্রিক ও পুষ্টিগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। নিচে ডাল ফসলের গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো—

১. ডাল ফসল উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের প্রধান উৎস (প্রজাতিভেদে ডালে ২০-৩০% আমিষ থাকে)।

২. আমিষের সহজতম ও স্বল্পমূল্যে প্রাপ্ত একমাত্র উৎস ডাল, যা দিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টিস্বল্পতা দূর করা সম্ভব।

৩. ডাল লিগিউম জাতীয় ফসল, তাই ডাল নদীর চরসহ অন্যান্য অনুর্বর জমিতে সহজেই অল্প খরচে চাষ করা যায়।

৪. ডাল ফসল বাতাসের নাইট্রোজেনকে সংবন্ধন করে মাটিতে দেয় বলে ইউরিয়া সারের প্রয়োজন কম হয়।

৫. ডাল ফসল অন্য ফসলের সাথে সাথি ফসল হিসেবেও আবাদ করা যায় (যেমন— সরিষা, তিসি, আখ, গম ইত্যাদি), ফলে অতিরিক্ত আবাদি জমির প্রয়োজন হয় না।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আমাদের দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টিমান বজায় রাখতে এবং জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে ডাল জাতীয় ফসলের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১৪ আখচাষি রফিকুল ইসলাম আখ চাষের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে চাষ করায় ফলন বেশি হয়েছে। তার প্রতিবেশী জব্বার ফলন বেশি হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে রফিকুল রোপা পদ্ধতি, আন্তঃপরিচর্যাসহ ফলন বৃদ্ধির পদ্ধতিগুলোর কথা বললেন। জব্বার আখ খন্ড রোপণ করলেও কিছু চারা গজায়নি। তিনি মাটি খুঁড়ে দেখেন সাদাটে পোকা। ◀ *শিখনফল-৩*

ক. সাকার কী? ১

খ. আঁশ জাতীয় ফসল কেন চাষ করা হয় ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রফিকুল ইসলামের আখ রোপণের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. জব্বারের করণীয় কী ছিল এখন বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাকার হলো রাইজোম হতে উৎপন্ন এক ধরনের রূপান্তরিত কাণ্ড যা দ্বারা উদ্ভিদের অঙ্গজ প্রজনন হয়।

খ আঁশ উৎপাদনের জন্য যেসব ফসল চাষ করা হয় তাদের আঁশ জাতীয় ফসল বলে। যেমন- পাট ও তুলা।

বাংলাদেশে আঁশ জাতীয় ফসলের গুরুত্ব অপরিসীম। বস্ত্র তৈরির প্রধান উপাদান হলো এই আঁশ। আঁশ থেকে সুতা, চট, কার্পেট ও বিভিন্ন শৌখিন জিনিস তৈরি করা হয়। পাট গাছের পাতা সবজি ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তুলা থেকে তেল, সাবান ইত্যাদি তৈরিসহ এটি পশুর খাদ্য ও জৈব সার হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। এছাড়া আঁশজাতীয় ফসলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্প এদেশে গড়ে উঠেছে।

গ আখচাষি রফিকুল ইসলাম আখ চাষের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে আখ চাষ করেন।

রফিকুল ইসলাম রোপা পদ্ধতিতে আখ রোপণ করার জন্য এক বা দুই চক্ষুবিশিষ্ট আখ খণ্ড নির্বাচন করেন। এই আখ খণ্ডগুলো তিনি ১৫ × ১০ সেমি^{২} আকারের পলিব্যাগে অথবা ৩মি × ১মি × ১০ সেমি আকারের বীজতলায় আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে রোপণ করেন। বীজ খণ্ড পাশাপাশি স্থাপন করে হালকা মাটি, খড় বা কচুরিপানা দিয়ে ঢেকে দেন। প্রয়োজনমতো সেচ প্রদান করেন। চারার বয়স ৫০-৬০ দিন বা ৪-৫ পাতা বিশিষ্ট হলে সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর পর্যন্ত চারাগুলো মূল জমিতে রোপণ করেন। মুড়ি আখের ক্ষেত্রে গাছের পাতা কেটে দেওয়ার পর প্রতিটি চোখ থেকে পার্শ্বমমুকুল গজায়। ৪০-৪৫ দিন বয়স হলে মাতৃ আখ থেকে কেটে নিয়ে মূল জমিতে রোপণ করতে হয়।

উপরের পদ্ধতি অবলম্বন করে রফিকুল ইসলাম আখ রোপণ করেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকের জব্বার সাহেবের সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করে বোঝা যায় তার চাষকৃত আখে উইপোকার আক্রমণ হয়েছে।

উইপোকার মাথা ও বুক গাঢ় বাদামি রঙের এবং পেট সাদাটে রঙের হয়। এরা লাগানো আখ খন্ড খেয়ে ফেলে বলে চারা গজাতে পারে না। তবে আখ হওয়ার পর আক্রমণ হলে চারা শুকিয়ে যায়। জব্বার সাহেব এই অবস্থা প্রতিকারে তার আবাদি জমি কয়েকদিন সেচ দিয়ে পানিতে ডুবিয়ে রাখতে পারেন। ক্ষেতে মাটির পাতিলে পাটখড়ি ভরে পুঁতে রাখতে হবে, এতে উইপোকা জমা হবে। ১৫ দিন পরপর এগুলো সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এছাড়াও ভিটামিন ৪৮ ইসি বা ক্লোরোপাইরিফস স্প্রে করতে হবে। রোগ প্রতিরোধী জাত হিসেবে ঈশ্বরদী ১৬, ঈশ্বরদী ১/১৫৫ ইত্যাদি চাষ করতে হবে। এছাড়া উইপোকা প্রতিরোধে মুড়ি আখের চাষ করা যাবে না।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে জব্বার সাহেব তার আখের জমিতে উইপোকার আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন। তবে রোগ প্রতিরোধী আখের জাত ব্যবহার করাই উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ১৫ আখ বাংলাদেশের একটি প্রধান অর্থকরী ফসল। আখ থেকে উৎপাদিত চিনি বিভিন্ন প্রকার খাদ্য তৈরিতে এবং উপজাত দ্রব্য (যেমন– ছোবড়া) শিল্পকারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ◀ *শিখনফল-৩*

ক. রেটুন বা মুড়ি চাষ কাকে বলে? ১

খ. আখ ফসলের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ফসলটির জমি তৈরির পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ফসলটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথমবার আখ কাটার পর গাছের গোড়া থেকে বের হওয়া কুশি দ্বারা পুনরায় আখ চাষ করাকে রেটুন বা মুড়ি চাষ বলে।

খ আখ ফসলের বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ তৈরি করে দেহে জমা রাখে।
২. দীর্ঘমেয়াদি বা বহুবর্ষজীবী খরা সহ্যকারী উদ্ভিদ।
৩. অঙ্গজ উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে।
৪. কাণ্ড শক্ত এবং শাখাবিহীন।
৫. গুচ্ছমূল বিদ্যমান।
৬. মুড়ি আখ চাষ করা যায়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ফসলটি হলো আখ। নিচে আখ চাষের জন্য জমি তৈরির পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো–

আখ দীর্ঘমেয়াদি ফসল বলে জমি থেকে প্রচুর পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে। আখ গাছের শিকড় যাতে মাটির গভীরে গিয়ে খাদ্যরস গ্রহণ করতে পারে সেজন্য জমি গভীরভাবে চাষ দিতে হবে। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে জমির জো অবস্থায় (পর্যাপ্ত রস থাকা অবস্থায়) উপযুক্ত কর্ষণ যন্ত্র দ্বারা ৫/৬টি চাষ দিয়ে মিহি করে জমি প্রস্তুত করতে হবে। আখ চাষের জন্য জমি চাষের গভীরতা অন্তত ৮ ইঞ্চি হওয়া উচিত। এজন্য চাষ কাজে ট্রাক্টর ব্যবহার করা উত্তম। জমিতে উঁইপোকা থাকলে চাষের সময় 'রিজেন্ট ৩ জি আর' নামক কীটনাশক মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে পুরো জমিকে ৬০ মি দৈর্ঘ্য ও ১৫ মি প্রস্থ বিশিষ্ট ফালিতে ভাগ করে নালা কাটতে হবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত আখ ফসলটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিচে বিশ্লেষণ করা হলো–

১. চিনি ও গুড় উৎপাদনের প্রধান ফসল হচ্ছে আখ।
২. চিনিকল এলাকায় আখ উৎপাদন করাকে কৃষক ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেছে।
৩. চিনি বিদেশে রফতানির সুযোগ রয়েছে।
৪. আখের ছোবড়া কাগজ, কৃত্রিম রেশম, ফাইবার বোর্ড তৈরি ও জ্বালানি কাজে ব্যবহার করা যায়।
৫. আখের শুকনা পাতা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৬. চিটাগুড় পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৭. ছোবড়া পোড়ানো ছাইয়ে ৮% পটাশ থাকে, যা জৈবসার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
৮. প্রেসমাড (Pressmud) বা ফিল্টার কেক (Filter cake) মাড জৈবসার হিসেবে ও মোম তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৬ মতিন চাষি এবার সয়াবিন চাষ করবেন। এ ব্যাপারে পরামর্শ নিতে একজন কৃষিবিদের নিকট গেলেন। তিনি মতিন সাহেবকে চাষের পদ্ধতি ও সার দেওয়ার ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন। *◀ শিখনফল-৪*

ক. মাঠ ফসল কাকে বলে? ১
খ. আখ পরিপক্ক অবস্থায় কাটতে হয় কেন? ২
গ. মতিনের ফসল চাষে মাটি ও জলবায়ু কেমন হতে হবে? ৩
ঘ. সার প্রয়োগের ব্যাপারে মতিন কী জানতে পেরেছিলেন- বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব ফসল সাধারণত বিস্তীর্ণ মাঠে, বেড়াবিহীন অবস্থায় সমষ্টিগতভাবে পরিচর্যার মাধ্যমে চাষ এবং প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়া হয় সেগুলোকে মাঠ ফসল বলে।

খ অপরিপক্ক আখে সঠিকভাবে গ্লুকোজ ও সুক্রোজ সংবন্ধন হয় না। ফলে চিনি ও গুড়ের পরিমাণ কমে যায়। এ কারণেই আখ পরিপক্ক অবস্থায় কাটতে হয়।

গ মতিনের চাষকৃত ফসলটি হলো সয়াবিন।
উপযুক্ত মাটি ও জলবায়ুতে সয়াবিনের ফলন ভালো হয়। সয়াবিন বিভিন্ন রকম মাটিতে জন্মাতে পারে। বেলে থেকে এঁটেল মাটিতে এ ফসলের চাষ হয়। তবে পলিমাটি ও এঁটেল দোআঁশ মাটিতেই সয়াবিন ভালো জন্মায়। এই মাটির অম্লমান (pH) ৬.৫-৭.৫ হওয়া উচিত। সয়াবিন গাছ গরম ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় ভালো জন্মাতে পারে।এই ফসলের অনুকূল দিনের তাপ হচ্ছে ২৪-৩০° সে.। বৃষ্টির পরিমাণ ৫০০ মিলিমিটার এর কাছাকাছি হলে সয়াবিনের চাষ করা যায়।
উপরে উল্লিখিত ধরনের মাটি ও জলবায়ু পেলে সয়াবিনের ফলন ভালো হয়। অন্যথায় এ থেকে লাভের পরিমাণ খুব কম হয়।

ঘ কী পরিমাণ ও কোন পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে সে ব্যাপারে মতিন কৃষিবিদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন।
সয়াবিনের জমিতে কমপক্ষে ১৫-২০ কেজি নাইট্রোজেন (N) সার দেওয়া দরকার। ৩০ কেজি ফসফরাস সার (P_2O_5) দিতে পারলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। তবে খুব ভালো ফলন পেতে হলে ৬০ কেজি ফসফরাস সার (P_2O_5) দিতে হবে। প্রতি হেক্টর জমিতে ৫০-৬০ কেজি ইউরিয়া, ১৫০-১৭৫ কেজি টিএসপি, ১০০-১২০ কেজি এমওপি, ১০০-১২০ কেজি জিপসাম, ৩০০-৫০০ কেজি ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে।
সকল সার জমি প্রস্তুতের শেষ পর্যায়ে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। অম্ল জমিতে ডলোচুন মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রতি কেজি বীজে ৬৫-৭৫ গ্রাম অণুজীব সার বা রাইজোবিয়াম জ্যাপোনিকাম ইনোকুলাম মিশিয়ে দিতে হবে। সারের পরিমাণ সার প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকলে সে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। অণুজীব ইনোকুলাম মিশানোর পর বীজ সাথে সাথে বপন করতে হবে। অণুজীব সার ব্যবহার করলে সে জমিতে আর অতিরিক্তভাবে ইউরিয়া প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। জমিতে প্রতি হেক্টর ৫০০-৯০০ কেজি শুকনো গুঁড়ো সুষম কম্পোস্ট ব্যবহার করলে ফলন বৃদ্ধি পায়।
সুতরাং, সার প্রয়োগ সম্পর্কিত উল্লিখিত পদ্ধতি তিনি কৃষিবিদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন এবং সে মোতাবেক কাজ করে তিনি লাভবানও হন।

প্রশ্ন ▶ ১৭ সয়াবিন কীভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে তা আলোচনা করে আজ রুহুল আমীন স্যার বোর্ডে একটি ছক আঁকলেন। ছকটি নিম্নরূপ:

পোকার নাম	ক্ষয়ক্ষতির ধরন	প্রতিকার
শিম মাছি		
হলদে মোজাইক রোগ		
মরিচা রোগ		

◀ শিখনফল-৪

ক. ওষুধি ফসল কাকে বলে? ১
খ. সূর্যমুখীর বীজ ছিটিয়ে বপন করা উচিত নয় কেন? ২
গ. ছকটি পূরণ করে খাতায় লেখো। ৩
ঘ. সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে স্যারের আলোচ্য বিষয়টি উপস্থাপন করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব ফসল ওষুধ তৈরি বা এ সংক্রান্ত কাজের জন্য উৎপাদন করা হয়, সেগুলোকে ওষুধি ফসল বলে।

খ সূর্যমুখীর বীজ ছিটিয়ে বপন করা হলে গাছ সমস্ত জমিতে সমদূরত্বে থাকে না। এতে বীজের অঙ্কুরোদগম কম হয় এবং পরিচর্যার সমস্যা হয়। এ কারণে সূর্যমুখীর বীজ ছিটিয়ে বপন করা উচিত নয়।

গ উদ্দীপকে রুহুল আমিন স্যার সয়াবিনের বিভিন্ন পোকার নাম, ক্ষয়ক্ষতির ধরন ও প্রতিকার সম্পর্কিত একটি ছক আঁকেন। পূরণকৃত ছকটি নিম্নরূপ:

পোকার নাম	ক্ষয়ক্ষতির ধরন	প্রতিকার
শিম মাছি	পোকা পাতায় ডিম পাড়ে। শূককীট পাতার বোঁটা ছিদ্র করে। এতে চারা গাছ মারা যায়।	রিপকর্ড-১০ প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে বা নগস প্রয়োগ।

পোকার নাম	ক্ষয়ক্ষতির ধরন	প্রতিকার
হলদে মোজাইক রোগ	পাতায় সোনালি হলদে দাগ হয়। এই রোগ জাব পোকা দিয়ে বিস্তৃত হয়।	জাব পোকা দমন; ম্যালাথিয়ন ২৫ প্রয়োগ।
মরিচা রোগ	পাতার নিচের দিকে হালকা বাদামি থেকে লালচে বর্ণের দাগ হয়। পাতা ঝরে যায়।	রোভরাল- ৫০,২ গ্রাম/লি হারে স্প্রে করতে হবে।

ঘ স্যারের আলোচ্য বিষয় ছিল সয়াবিন কীভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

ফসল পাকার সময় হলে গাছের পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়তে শুরু করে। ফলের রং খয়েরি হয়ে শুকিয়ে যায়। যদি ঠিক সময়ে ফসল কাটা না হয় তবে কিছু ফল ফেটে গিয়ে ঝরে পড়ে। গোড়া থেকে গাছ কেটে শিকড় মাটির সঙ্গে রাখতে হয়। গাছ রোদে শুকানোর পর একটি লাঠি দিয়ে ফসল মাড়ানো হয়। মাড়ানোর সময় খুব সাবধানে মাড়াই করতে হবে যেন বীজের ক্ষতি না হয়। ফসল মাড়ানোর পর তা ঝেড়ে রোদে শুকিয়ে গুদামজাত করা হয়।

বাংলাদেশে সয়াবিনের বীজ রাখা বেশ কষ্টকর ব্যাপার। তবে খুব যত্ন নিয়ে বীজ পরিষ্কার করে এবং রোদে শুকিয়ে মজুত করলে বেশ কিছুদিন বীজ রাখা চলে। বীজে পানির পরিমাণ যদি ১২% এর নিচে কমিয়ে আনা যায়, তাহলে এক বৎসর পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা যেতে পারে। বীজ পলিথিন ব্যাগে বন্ধ করে রাখলে ১০ মাস পর্যন্ত গজানো ক্ষমতা বিদ্যমান থাকতে পারে।

উল্লিখিত উপায়ে সয়াবিন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করলে দীর্ঘদিন তা ভালো থাকে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ বাবলু চাষির বাড়ি বরিশালে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রচার প্রচারণায় বাবলু উদ্বুদ্ধ হয়ে তেল তৈরির আশায় সয়াবিন চাষ করে ভালো ফলন পায়। কিন্তু তেল তৈরি বা সয়াবিন দানা বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে না পেরে সে আর সয়াবিন চাষ করে না। নোয়াখালীর জমিল মিয়া প্রতি বছরই সয়াবিন চাষ করে সয়াবিন শিল্প এলাকায় বিক্রি করে লাভবান হচ্ছে। ◀ *শিখনফল-৪*

ক. লিগিউমিনাস শস্য কী? ১

খ. তেল জাতীয় ফসল কেন প্রয়োজন ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জমিল মিয়ার সয়াবিন চাষ করে লাভবান হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. বাবলু সয়াবিন তেল তৈরি বা দানা বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারেনি কেন বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসকল শস্য তাদের শিকড়ের গুটিতে বায়বীয় নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে রাখতে সক্ষম সেসকল শস্যই হলো লিগিউমিনাস শস্য।

খ যেসব ফসলের বীজ থেকে তেল পাওয়া যায় তাদের তেল জাতীয় ফসল বলে।

তেল জাতীয় ফসল প্রয়োজন কারণ- এগুলো আমাদের ভোজ্যতেলের চাহিদা মেটায়। সয়াবিনে ৪০-৪৫% আমিষ যা দেহের আমিষের চাহিদা পূরণ করে। সূর্যমুখীর তেল ওষুধ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এছাড়া তেল থেকে তৈরি মোম, সাবান ও সয়াখাদ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে। তেলের খৈল উন্নতমানের জৈব সার এবং শুকনো গাছ জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

গ জমিল মিয়া সয়াবিন চাষ করে ও শিল্প এলাকায় বিক্রি করে লাভবান হয়।

বর্তমানে সয়াবিন ভোজ্যতেল হিসেবে ব্যবহার হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের খাদ্য ও শিল্প সামগ্রী তৈরিতে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার হচ্ছে। যেমন– অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান সয়াবিন থেকে মোম ও সাবান তৈরি করছে। গাজীপুর ও ঢাকায় যেসকল পোল্ট্রি খাদ্য শিল্প গড়ে উঠেছে সেখানে সয়াবিন কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এগুলোর পাশাপাশি সয়াবিন দ্বারা বিস্কুটও তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়াও সয়াবিন রুটি তৈরিতে, ডাল হিসেবে, হালুয়া তৈরিতে, সয়া সেমাই, সয়া ছানা, সয়া সন্দেশ, সয়া-সিঙ্গাড়া, সয়া-পুরি, সয়া দুধ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে এর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, শুধু শিল্প এলাকায় জমিল মিয়া তার উৎপাদিত সয়াবিন বিক্রি করার কারণে লাভবান হন। কারণ শিল্প এলাকায় সয়াবিনের চাহিদা অনেক বেশি।

ঘ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রচার প্রচারণায় বাবলু উদ্বুদ্ধ হয়ে সয়াবিন চাষ করে ভালো ফলন পায় কিন্তু তা বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে না পারায় সে সয়াবিন চাষে আগ্রহ হারায়।

বাবলু জানত না স্থানীয় ঘানি বা বর্তমানে দেশে প্রচলিত এক্সপেলারে সয়াবিন থেকে তেল নিষ্কাশন যন্ত্রের মাধ্যমে এর বীজ থেকে তেল নিষ্কাশন করা সম্ভব। এর জন্য প্রচুর পরিমাণ বীজ প্রয়োজন। কিন্তু পর্যাপ্ত বীজের অভাবে এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে সয়াবিনের তেল নিষ্কাশনের কাজ শুরু হয়নি। এছাড়া সে আরও জানত না যে পোল্ট্রি খাদ্য তৈরি প্রতিষ্ঠানে সয়াবিন বীজ পশুপাখির খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সয়াবিন তেলের খৈল উন্নতমানের জৈব সার এবং মাড়াইয়ের পর শুকনো গাছ জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

সয়াবিন থেকে বিভিন্ন ধরনের সয়াখাদ্য যেমন– হালুয়া, বিস্কুট, ছানা, সন্দেশ ইত্যাদি তৈরির সুবিধা থাকার কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সয়াবিনের যে ক্রমাগত চাহিদার সৃষ্টি হচ্ছে সে সম্পর্কেও সে অবগত ছিল না। তৈরিকৃত এসকল সয়াখাদ্য, অন্যান্য উপকরণ যেমন– মোম, সাবান ইত্যাদির বিদেশে যে প্রচুর চাহিদা রয়েছে তিনি সেটিও উপলব্ধি করতে পারেন নি।

সুতরাং আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, সয়াবিনের সঠিক ব্যবহার না জানার জন্য বাবলু সয়াবিনের দানা বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারেনি। ফলে সে এ ফসল চাষে তেমন লাভও করতে পারেনি।

প্রশ্ন ▶ ১৯ সুরুজ মিয়া তার ২ বিঘা জমিতে এ বছর সূর্যমুখী চাষ করেছে। জমিতে গাছ ও ফুল ভালো হওয়ায় সে নিশ্চিন্তে বাড়িতে বসে আছে। প্রায় দুই সপ্তাহ পর জমিতে গিয়ে দেখে তার জমির সব গাছ ঢলে পড়েছে এবং শুকিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় সে তাৎক্ষণিক কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করায় অল্প কিছু দিনের মধ্যে গাছের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যায়।

◀ শিখনফল-৪

ক. তেল জাতীয় ফসল কী? ১

খ. তেল জাতীয় ফসলের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ২

গ. উল্লিখিত ফসলের রোগটির কারণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ফসলের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বীজ থেকে তেল আহরণের জন্য যেসব ফসল চাষ করা হয় তাদেরকে তেল জাতীয় ফসল বলে।

খ তেল জাতীয় ফসলের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো–

i. তেল জাতীয় ফসলের বীজে প্রজাতিভেদে ২০-৪৮% ভোজ্য তেল থাকে।

ii. অধিকাংশ আলো নিরপেক্ষ। কিছু আলোক সংবেদনশীল।

iii. একবর্ষজীবী উদ্ভিদ এবং অধিকাংশ রবি মৌসুমের ফসল।

iv. বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ এবং অধিকাংশেরই দানা ছোট।

v. জীবনকাল কম ৯০-১১০ দিন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সূর্যমুখীর রোগটি হলো ঢলে পড়া রোগ। নিচে এই ঢলে পড়া রোগের কারণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা আলোচনা করা হলো–

রোগের কারণ: *Sclerotium rolfsii* নামক ছত্রাকের কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। খরিপ মৌসুমে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। এটি বীজ ও মাটিবাহিত রোগ।

প্রতিকার:

১. বীজ বপনের পূর্বে ভিটাভেক্স-২০০ দ্বারা বীজ শোধন করতে হবে।

২. শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে।

৩. রোগ দেখা দিলে ভিটাভেক্স-২০০ দ্বারা মাটি শোধন করতে হবে।

৪. জমিতে প্লাবন সেচ দিতে হবে। এতে জমি পানি সিক্ত হয়ে ছত্রাক মারা যাবে।

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ফসলের ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ফসলটি হলো তেল জাতীয় ফসল। নিচে তেল জাতীয় ফসলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো–

i. চর্বি জাতীয় খাদ্য হিসেবে দৈনন্দিন জীবনে ও মানবদেহে তেলের গুরুত্ব অপরিহার্য। পুষ্টিবিদগণের মতে, একজন মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যশক্তির ১৫-২০% তেল থেকে আসা উচিত।

ii. ভোজ্যতেলের প্রধান উৎসই হচ্ছে তেল জাতীয় ফসল।

iii. তেল অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি অ্যাসিডের উৎস। তেলবীজ সরাসরি খাওয়া যায়, ফলে মিশ্র খাদ্যে আমিষের আনুপাতিক দক্ষতা বেড়ে যায়।

iv. লিনোলিক অ্যাসিড সম্পন্ন তেল খেলে উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমে, যেমন– সূর্যমুখী, কুসুমফুল, গর্জনতিল বীজের তেল।

v. তেল দ্রবণীয় ভিটামিনগুলোর বাহক ও ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে (A, D, E K) পরিশোষণে সহায়তা করে এবং দেহের প্রয়োজনীয় তাপশক্তি সরবরাহ করে।

vi. তেল দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে বাফার হিসেবে কাজ করে। শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিতে তেলের প্রয়োজন।

vii. তেলজাতীয় ফসল জমি থেকে ক্ষতিকর ভারি মৌল শোষণ করে ভূমির উর্বরতা বাড়ায়। যেমন– সূর্যমুখী।

viii. বিভিন্ন প্রকার শিল্পজাত সামগ্রী যেমন– মোম, সাবান তৈরিতে নানা প্রকার তেল ব্যবহৃত হয়। বার্নিশসহ বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে তিসির তেল ব্যবহৃত হয়। তিলের খৈল জমিতে জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পুষ্টিমান বিচারে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে তেল জাতীয় ফসলের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ২০ আজ রতন তার শ্রেণিশিক্ষকের নিকট পাট এর চাষ পদ্ধতিসহ এর গুরুত্ব জানতে পারল। তিনি বাংলাদেশে পাট এর সম্ভাবনার কথা বললেন।

◀ শিখনফল-৫ ◀ শ্রেণির কাজ: ড. মোঃ তৌহিদুল ইসলাম; / Text পৃষ্ঠা-৩৬৯

ক. ফল জাতীয় ফসল কাকে বলে? ১

খ. সূর্যমুখী ক্ষেতে মৌবাক্স স্থাপন করতে হয় কেন? ২

গ. ফসলটি চাষের জন্য কী ধরনের মাটি ও জলবায়ু প্রয়োজন লেখো। ৩

ঘ. শিক্ষক সম্ভাবনার যে দিকগুলো তুলে ধরেছিলেন তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফলের জন্য যেসব ফসল উৎপাদন করা হয় সেগুলোকে ফল জাতীয় ফসল বলে।

খ সূর্যমুখী পরপরাগী ফসল। পরাগায়ন ঠিকমতো না হলে সূর্যমুখী বীজের উৎপাদন কমে যায়। মৌমাছি ফুলে পরাগায়ন ঘটায়। তাই পরাগায়নের সুবিধার জন্যই সূর্যমুখী ক্ষেতে মৌবাক্স স্থাপন করতে হয়।

গ প্রত্যেকটি ফসলের একটি উপযুক্ত জলবায়ু ও মাটির নির্দিষ্ট প্রকৃতি থাকে, তেমনি পাটেরও আছে।

পাট উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার ফসল। পাট উৎপাদনের জন্য অনুকূল তাপমাত্রা ২৫-৩৫° সে. এবং বায়ুমণ্ডলের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০%। ১২৫-২০০ সেমি বৃষ্টিপাত পাটের জন্য উপকারী। বৃষ্টিপাতের মধ্যে অন্ততপক্ষে ৩০ সেমি ফসলের প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে হলে ফলন বৃদ্ধি পায়।

গাছের দৈহিক বৃদ্ধির সময়ে একান্তভাবে বৃষ্টিপাত উচ্চ ফলনে সহায়ক। চারা বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ক্ষতিকর। কারণ চারা অবস্থায় পাট জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই আগাম বপন করা প্রয়োজন। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ মাটি পাট চাষের জন্য উত্তম। পলি দোআঁশ ও দোআঁশ বুনটের মাটিতে পাটের ফলন ও আঁশের মান ভালো হয়। তবে এঁটেল থেকে শুরু করে বেলে দোআঁশ মাটিতেও পাট চাষ করা যায়।

সুতরাং, পাটের ভালো ফলনের জন্য উল্লিখিত ধরনের মাটি ও জলবায়ু প্রয়োজন।

ঘ শিক্ষক পাট চাষের বিভিন্ন সম্ভাবনার দিক তুলে ধরেছিলেন। বর্তমানে বিশ্বে কৃত্রিম আঁশের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও পাটের গুরুত্ব কম নয়।

বর্তমানে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে পাটের বহুবিধ ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন– পাটকাঠি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার, ঘরবাড়ি তৈরি এবং ক্ষেতে বেড়া দেওয়ার কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে। পাটকাঠি দিয়ে বেশ সস্তায় উৎকৃষ্ট মানের কাগজ, হার্ডবোর্ড ও চট তৈরি করা যায় এবং একে অন্যান্য বিকল্প কাজেও ব্যবহার করা যায়। পাটের কচি পাতা শাক হিসেবে খাওয়া যায়। পাটের পাতা মাটিতে পচে প্রচুর জৈব পদার্থ সৃষ্টি করে। এজন্যে পাটের জমিতে ধানের ফলন ভালো হয়। সবুজ পাট থেকে কাগজ-মণ্ড উৎপাদনের প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা হয়েছে। তুলার সাথে পাট একত্রে ব্যবহার করে 'জুটন' (৭০% পাট + ৩০% তুলা) নামক কাপড় আবিষ্কৃত হয়েছে যার মাধ্যমে বাংলাদেশে কাগজ ও বস্ত্রশিল্পে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসতে পারে।

সুতরাং, বাংলাদেশে পাট চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এর চাষের মাধ্যমে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আনয়ন করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ২১ দেশে পাটের দাম কম এবং তুলার ফলন কম হওয়ায় চাষিরা পাট ও তুলা চাষ করতে কম আগ্রহী। তাই সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসের কর্মকর্তারা পৃথকভাবে তুলা চাষি ও পাট চাষিদের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের ব্যবস্থা নেওয়ায় তুলা ও পাট চাষে আগ্রহী হয়। কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণে বলেন, তুলা ও পাটের রপ্তানি ও বিভিন্ন শিল্পে চাহিদা আছে। এতে দেশের তুলা ও পাটের উৎপাদন বাড়ে এবং চাহিদা পূরণ হয়। *◀ শিখনফল-৫*

ক. গ্রিনিং কী? ১

খ. পাট চাষে আলোর প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. তুলা ও পাট দিয়ে উদ্দীপকের কোন কোন ক্ষেত্রে চাহিদা পূরণ হয় ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পাটের দাম বৃদ্ধি ও তুলার উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয় বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিনিং হলো কমলার এক প্রকার রোগ যাতে আক্রান্ত গাছের পাতা হলদে হয়, শিরা দুর্বল হয়, পাতার আকার ছোট ও সংখ্যায় কম হয়।

খ আঁশ উৎপাদনের জন্য যেসব ফসল চাষ করা হয় সেগুলোকে আঁশ জাতীয় ফসল বলে। যেমন- পাট।

পাট চাষে আলোর প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পাট আলোকসংবেদনশীল উদ্ভিদ। যার কারণে দিবা-দৈর্ঘ্য ফলনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই চৈত্র মাসের ১ম সপ্তাহের পর দেশি জাত (সিভিএল-১, সিভিই-৩) ও বৈশাখ মাসে তোষা জাত (৩-৮) জমিতে বপন করা হলে আগাম ফুল আসে না এবং ফলন ভালো হয় না।

গ পাট ও তুলা আঁশ জাতীয় ফসল যা আমাদের দৈনন্দিন বিভিন্ন ব্যবহার্য জিনিসের চাহিদা পূরণ করে থাকে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতি প্রয়োজনীয় বস্ত্র তৈরির প্রধান কাঁচামাল আসে পাট ও তুলা থেকে। এছাড়াও পাট দিয়ে চট, কার্পেট, বস্তা, দড়ি ইত্যাদি তৈরি করা হয়। তুলা থেকে তৈরি করা হয় সুতি বস্ত্র। পাটখড়ি ও শুকনো পাট গাছ জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার হয়ে থাকে। পাট শাক ও শুকনা পাতা রোগ প্রতিরোধ করে। দেশের ৯৪টি সুতাকলে ও বস্ত্রকলের প্রধান কাঁচামাল আসে তুলা থেকে। এছাড়াও বিভিন্ন পাটকল ও কাগজ শিল্পে পাট গাছ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পাট ও তুলা এবং এদের থেকে তৈরি জিনিসপত্র দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা যায়।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, পাট ও তুলা দেশের বস্ত্র, তৈজসপত্র, জ্বালানি, শিল্পের কাঁচামালসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাহিদা পূরণ করে থাকে।

ঘ দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের দাম কম ও তুলার ফলন কম হওয়ায় চাষিরা এগুলো চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেললে কৃষি কর্মকর্তারা কৃষকদের এগুলো চাষে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন।

পাট ও তুলা দেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল হওয়া সত্ত্বেও দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে এর ন্যায্যমূল্য কৃষক পায় না। অন্যদিকে যথাযথভাবে তুলা চাষ করতে না পারায় তুলার ফলনও ভালো হয় না বলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এমতাবস্থায় পাট ও তুলা চাষিদের এগুলো চাষে উৎসাহিত করার জন্য সরকারি অফিসের কর্মকর্তারা চাষিদের সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সুযোগ করে দেন। এ প্রশিক্ষণে কর্মকর্তারা চাষিদের ভালো ফলন পাওয়ার সকল পদ্ধতি হাতে-কলমে শেখান এবং বিভিন্ন শিল্পে ও রপ্তানিতে পাট ও তুলার গুরুত্বের কথা বলেন। চট, কার্পেট, বস্তা, দড়ি ইত্যাদি তৈরি; কুটির শিল্প ও কাগজ শিল্পে পাটের অনেক চাহিদা দেশ এবং বিদেশে রয়েছে। আবার বস্ত্র তৈরির প্রধান কাঁচামাল হলো তুলা। বিভিন্ন বস্ত্র শিল্পে তুলার চাহিদা অনেক; এছাড়া তুলার বাজারদরও অনেক বেশি। এসকল বিষয়ও কর্মকর্তারা আলোচনা করেন। ফলে কৃষকরা যথাযথ প্রশিক্ষণ পেয়ে এবং পাট ও তুলার চাহিদার কথা জেনে পাট ও তুলা চাষে আগ্রহী হন। এতে পাট ও তুলার উৎপাদন বাড়ে এবং চাহিদাও পূরণ হয়।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, তুলা ও পাট কর্মকর্তাদের কার্যক্রম তুলা ও পাট ফসলের ফলন বৃদ্ধি ও দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সহায়তা করে।

প্রশ্ন ▶ ২২ জমিল লালমনিরহাটে কমলা চাষ করে জাতীয় কৃষি পদক পেয়েছেন। তিনি বাজার থেকে উন্নতজাতের কমলা ক্রয় করে এনে বীজ সংগ্রহ করে বীজতলায় বপন করে চারা উৎপাদন করে। চারার বয়স ১ বছর হলে এই চারায় চোখ কলম করে অযৌন চারা উৎপাদন করে প্রধান জমিতে রোপণ করেন। এই গাছ থেকে উৎপাদিত কমলা বাজার থেকে ক্রয় করা কমলার মতো হয়। তিনি কমলার বিরাট বাগান করেছেন। জমিল বলেন, এভাবে সারাদেশে কমলার চাষ করা যাবে। ◀ *শিখনফল-৬*

ক. কেঁচো সার কী? ১

খ. পিঁয়াজের আন্তঃপরিচর্যা কেন করা হয় ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জমিল কীভাবে কমলার চারা উৎপাদন করেছিলেন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জমিল জাতীয় কৃষি পদক পাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেঁচো সার হলো একটি উন্নত জৈব সার যা তৈরি হয় কেঁচোর মল এবং কেঁচোর দেহ থেকে নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থ থেকে ।

খ পিঁয়াজের গুণগতমান উন্নয়ন ও ফলন বাড়ানোর জন্যেই আন্তঃপরিচর্যা করা হয়। পিঁয়াজের জমির কোথাও চারা মারা গেলে বা না গজালে সেখানে পুনরায় চারা রোপণ করা হয়। এতে ফলন কমার সম্ভাবনা থাকেনা। পুষ্পদণ্ড বা কলি একটু বড় হলেই ভেংগে দিলে পিঁয়াজ বড়, পুষ্ট, ঝাঁঝযুক্ত ও গুণগতমান সম্পন্ন হয়। মালচিং করলে মাটির রস সংরক্ষিত থাকে, ফলে পিঁয়াজ পুষ্ট হয়। এসব কারণেই পিঁয়াজের আন্তঃপরিচর্যা করা হয়।

গ জমিল অযৌন পদ্ধতিতে কমলার চারা উৎপাদন করেছিলেন। নিচে তার কমলার চারা তৈরির পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করা হলো:

তিনি শুকনো গোবর, ছাই ও দো-আঁশ মাটি দিয়ে বীজতলা তৈরি করেন। বীজতলার জন্য গাছের ছায়াযুক্ত স্থান নির্বাচন করেন। তিনি বীজতলার মাটি ভালোভাবে তৈরি করেন এবং বীজতলায় বীজ ছিটিয়ে বপন করেন। বীজতলায় বীজ বপনের পর তার উপর পাতলা ছাইয়ের আবরণ দিয়ে আধা ইঞ্চি পুরু মাটি দিয়ে ঢেকে দেন। বীজ বপনের সময় বীজতলায় পানি ব্যবহার করেন না। বীজ বপনের ৬/৭ দিন পর প্রতিদিন প্রয়োজনমতো পানি দেন। ১৫/২০ দিন পর থেকে বীজের অঙ্কুরোদগম শুরু হয়। কমলার একটি বীজ থেকে অনেকগুলো চারা জন্মে। এসব চারার মধ্যে একটি থাকে যৌন চারা, বাকিগুলো অযৌন চারা। জমিল এসব চারা পৃথক করে আলাদা বেডে বা পলিব্যাগে লালনপালন করে ১ বছর পর মূল জমিতে রোপণ করেন। দ্রুত ও ভালো ফল পেতে তিনি কলম করে কমলার চারা উৎপাদন করেন। জমিল চোখ কলম বা বাডিং পদ্ধতিতে চারা তৈরি করেন। অনুন্নত জাতের লেবু গাছকে আদি জোড়া হিসেবে ব্যবহার করে এর সাথে ভালো জাতের কমলা গাছ থেকে সতেজ কুঁড়ি এনে চোখ কলম পদ্ধতিতে জোড়া দেন। কমলার কলম তৈরির জন্য বৈশাখ/জ্যৈষ্ঠ মাস উপযুক্ত সময়। এসময়টিই কলমের জন্য বেছে নেন। গাছের গোড়ার দিকের ভালো ডাল দিয়ে কলম করেন। শাখার এক থেকে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ জায়গার ছাল তুলে কয়েকদিনের পুরানো গোবর ও এঁটেল মাটি পানি দিয়ে মিশিয়ে মণ্ড তৈরি করে সেখানে প্রলেপ দেন। কলমের স্থানটিকে স্বচ্ছ পলিথিন কাগজ বা চট দিয়ে বেঁধে দেন। এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে চারা তৈরি হয়। এভাবেই জমিল অযৌন পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জমিল অযৌন পদ্ধতিতে কমলার চারা উৎপাদন করেছিলেন।

কমলার চারা উৎপাদন করে কৃষিতে অবদান রাখার জন্য তিনি জাতীয় কৃষি পদক পেয়েছিলেন। জমিলের জাতীয় কৃষি পদক পাওয়ার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। তিনি বাজার থেকে কেনা উন্নতজাতের কমলা থেকে বীজ সংগ্রহ করে বীজতলায় বপন করে চারা উৎপাদন করেন। উৎপাদিত চারার চোখ কলম করে অযৌন চারা উৎপাদন করে জমিতে রোপণ করেন। এই গাছ থেকে উৎপাদিত কমলা বাজার থেকে ক্রয় করা কমলার মতো হয়।

এভাবে জমিল সাহেবের পন্থা অবলম্বন করে সারাদেশে অযৌন জননের মাধ্যমে কমলার চারা উৎপাদন করে পরিচর্যা করলে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে কমলা উৎপাদন করা সম্ভব। এর ফলে আমদানিকারক দেশগুলো থেকে কমলা আমদানি না করে দেশে উৎপাদিত কমলা দিয়ে অভ্যন্তরীন চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব।

অযৌন প্রজননের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক চারা উৎপাদন করার কৌশল আবিষ্কার করে কৃষিতে অবদান রাখা এবং কমলা চাষ করে বেকারত্ব দূর করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া সম্ভব বলে জমিল কৃষিতে পদক পান।

প্রশ্ন ▶ ২৩ মেহেরপুরের খলিলুর রহমান একজন খ্যাতনামা কুল চাষি। লাভজনক ব্যবসা হওয়ায় তিনি অন্যান্য ফসলের পরিবর্তে তার জমিতে উন্নত জাতের কুল চাষ করেন। কুল চাষের জন্য সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা, রোগ, পোকা দমনসহ যাবতীয় পরিচর্যা তিনি সময়মতো ও সঠিক পদ্ধতিতে করেন। মৌসুমের সময় তিনি শত শত মণ কুল ঢাকার বাজারে চালান করে প্রচুর টাকা আয় করেন।

◀ *শিখনফল-৭*

ক. পেয়ারার বৈজ্ঞানিক নাম লেখো। ১

খ. পেয়ারাকে গরিবের আপেল বলা হয় কেন? ২

গ. কুল চাষে খলিলুর রহমান যেভাবে রোগ ও পোকা দমন করেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ফল চাষে খলিলুর রহমান যেভাবে লাভবান হলেন – তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পেয়ারার বৈজ্ঞানিক নাম হলো– *Psidium guajava*।

খ পেয়ারা একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ফল যা খাদ্যপ্রাণ 'সি' এবং পেকটিন সমৃদ্ধ। এছাড়া পেয়ারা ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সমৃদ্ধ।

পেয়ারায় আপেলের চেয়ে বেশি পুষ্টিগুণ বিদ্যমান। কিন্তু পেয়ারার দাম আপেলের চেয়ে কম। তাই পেয়ারাকে গরিবের আপেল বলা হয়।

গ কুল চাষে খলিলুর রহমান যেভাবে রোগ পোকা ব্যবস্থাপনা করেন তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো–

খলিলুর রহমান কুল ক্ষেতে যেসব পোকা দেখা দিতে পারে সেগুলো সে নিম্নোক্ত উপায়ে দমন করেন–

মাছি পোকা: এ পোকা দমনে কুলগাছের গোড়ার মাটি গভীর করে কুপিয়ে দিতে হবে। এতে পোকার কীড়া মারা যায়। প্রতি লিটার পানির সাথে ডেসিস ২.৫ ইসি ১ মিলি হারে মিশিয়ে ফল সংগ্রহের এক থেকে দেড় মাস পূর্বে ১৫ দিন পরপর স্প্রে করতে হবে।

শুয়োপোকা: প্রাথমিক অবস্থায় ডিমসহ আক্রান্ত পাতা ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলে এদের দমন করা যায়। আর যদি আক্রমণের মাত্রা বেশি হয় তবে রিপকর্ড ১০ ইসি অথবা সিমবুশ ১০ ইসি অথবা ডায়াজিনন ৬০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

ফল ছিদ্রকারী পোকা: গাছ ফল ধরার পর থেকে ২০-২৫ দিন পরপর কীটনাশক ওষুধ ছিটালে এ পোকা দমন হয়।

কুলের মিলিবাগ: পাতলা কাপড় কেরোসিন/পেট্রোল দ্বারা ভিজিয়ে আক্রান্ত স্থানে মুছে দিলে এ পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে রিজেন্ট ৫০ ইসি অথবা মারশাল ২০ ইসি অথবা ডায়াজিনন ৬০ ইসি ২ মিলি/লি হারে ১০-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

খলিলুর রহমানের কুলের রোগগুলোর প্রতিকার পদ্ধতি নিচে আলোচনা করা হলো–

পাউডারি মিলডিউ রোগ: এটি কুলের ছত্রাকজনিত মারাত্মক রোগ। ডাইথেন-এম ৪৫ ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে প্রয়োগ করে এ রোগ দমন করা যায়। তাছাড়া বাগান পরিষ্কার রাখা ও মরা ডালপালা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ফলের পচন ও পাতার দাগরোগ: ১ চামচ ডাইথেন-এম ৪৫-১০ গ্যালন পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর অন্তর স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়। তাছাড়া রোগ দমনে গাছ ও বাগান পরিষ্কার রাখা বাঞ্ছনীয়।

ঘ কুল চাষ করে খলিলুর রহমান যেভাবে লাভবান হলেন তা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো–

পুষ্টির অভাব পূরণ: কুলে প্রচুর পরিমাণ খনিজ এবং ভিটামিন এ ও সি থাকায় খলিলুর রহমান তার এবং পরিবারের ভিটামিনের অভাব দূর করেন।

জ্বালানির চাহিদা পূরণ হয়: রান্নার কাজে কুলগাছের ডালপালা, লতা, শিকড়, পাতা ও কাঠ ব্যবহৃত হয়।

অর্থ অর্জন: খলিলুর রহমান তার বাগানের কুল বিক্রি করে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ অর্থ আয় করেন।

খাদ্য তৈরি: কুল দ্বারা আচার, চাটনি ও অন্যান্য মুখরোচক খাবার তৈরি হয়। এগুলো উৎপাদন, বিতরণ, ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে অনেক টাকার আর্থিক লেনদেন হয়। হাজার হাজার লোক এসব কাজের সাথে জড়িত থেকে বেকারত্ব দূর করে।

পারিবারিক আয় বৃদ্ধি: কুল চাষের মাধ্যমে পরিবারের আয় বৃদ্ধিপায় ও বেকারত্ব দূর হয়, দারিদ্র্য তা দূর হয় ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

গাছ ছায়া দেয়: ফল গাছ ছায়া দিয়ে বসতবাড়ি, রাস্তাঘাট, প্রতিষ্ঠান, হাটবাজার, লোকালয় প্রভৃতি শীতল রাখে। তাছাড়া ফলগাছ অক্সিজেন ও বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে পরিবেশ উপযোগী রাখে।

উপরোক্ত বিভিন্ন উপায়ে খলিলুর রহমান কুল চাষ করে লাভবান হলেন।

প্রশ্ন ▶ ২৪ রহিম বিএ পাস করে বেকার বসে আছেন। বেকারত্ব ও দারিদ্রতায় তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। দৈনিক পত্রিকায় 'ফল চাষে বহুমুখী উপকার' শিরোনামের প্রতিবেদনটি পড়ে রহিম ফল চাষে আগ্রহী হন। পরবর্তীতে তিনি কুল, পেয়ারা, কলা, লেবু, পেঁপে চাষ করে দারিদ্রতা দূর করেছেন। তার দেখাদেখি তার তিন বন্ধুও ফল চাষ করে বেকারত্ব দূর করেছে। ◀ *শিখনফল-৭*

ক. GOT কী? ১

খ. কুলের কোন জাতটি কেন ভালো ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রহিম ফল চাষের প্রতি আগ্রহী হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. ফল চাষ করে রহিমের দারিদ্রতা ও বন্ধুদের বেকারত্ব দূর করার বিষয়টি মূল্যায়ন করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক GOT হলো Ginning out Turn, বীজতুলা হতে শতকরা কত ভাগ আঁশ বের করা যায় তাকে GOT বলে।

খ কুল বা বরই বাংলাদেশে চাষযোগ্য দীর্ঘমেয়াদি ফল।

বাংলাদেশে চাষকৃত বিভিন্ন জাতের কুলের মাঝে বাউকুল ১ সর্বাপেক্ষা ভালো। প্রতিবছরে বাউকুল-১ এ দুইবার ফলন হয় এবং প্রতিবার ৮—১০ টন/হেক্টর ফলন হয়। বছরে দুইবার ফলন দেওয়ার কারণে বাউকুল-১ চাষ অত্যন্ত লাভজনক। অন্যদিকে বাউকুল-১ ফলের আকার বড় ও স্বাদ অতুলনীয়। ১ বিঘা জমিতে এই কুল চাষ করে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা লাভ করা যায়।

গ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন রহিমকে ফল চাষে আগ্রহী করে তোলে।

ফলের বহুমুখী ব্যবহার ও এ থেকে বিভিন্নভাবে আয়ের উৎস সম্পর্কে জেনেই মূলত রহিম ফল চাষে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। যেমন– ফল গাছের কাঠ আসবাবপত্র নির্মাণসহ বিভিন্ন কাঠের চাহিদা পূরণ করে। জ্বালানি হিসেবে ফল গাছের ডালপালা, শিকড় ব্যবহার করা হয়। অল্প জমিতে ফল চাষের মাধ্যমে অধিক আয় করা সম্ভব। ফল রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। অন্যদিকে দেশে প্রচুর ফল উৎপাদন হওয়ায় বিদেশি ফলের আমদানি কমে। এতে অর্থের সাশ্রয় হয়। ফল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে জুস, আচার, জেলি, মোরব্বা ইত্যাদি তৈরি ও ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন সম্ভব। কারণ প্রক্রিয়াজাতকৃত খাবারের বাজারমূল্য ও চাহিদা দুটোই অনেক বেশি। তাছাড়া কাঁচা ফলের চাহিদা সারা বছরই থাকে। ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অন্যতম উৎস হচ্ছে ফল। ফলের মৌসুমে বেশি করে ফল খেলে ভাতের ওপর চাপ কমে। ফলে খাদ্যাভাব দূর হয়। ফল, ফলের খোসা, পাতা, বীজ ইত্যাদি উন্নতমানের পশু ও হাঁস-মুরগির খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। ভূমিক্ষয় রোধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধ ও

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ফল গাছ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরে উল্লিখিত কারণে রহিম ফল চাষে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং নিজের বেকারত্ব লাঘবে সচেষ্ট হয়।

ঘ রহিম বিএ পাস করা একজন বেকার যুবক ছিলেন কিন্তু ফল চাষের মাধ্যমে তিনি ও তার বন্ধুরা বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্ত হন।

ফল চাষের মাধ্যমে রহিম তার পরিবারের চাহিদা পূরণ করার পর ফল বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হন। এ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তার তিন বন্ধুও ফল চাষের মাধ্যমে সফল হন। মাঠ ফসলের চেয়ে ফল চাষের উৎপাদন খরচ কম কিন্তু ফলের দাম বেশি। রহিম ও তার বন্ধুরা ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ যেমন— জুস, আচার, জেলি, মোরব্বা ইত্যাদিও তৈরি করেন যার বাজারমূল্য অনেক বেশি। এসব খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, বিতরণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে তারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ফল, বীজ, বাকল, লতা-পাতা ইত্যাদি যেমন ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে ব্যবহার করা যায় তেমনি গবাদি-পশুর খাদ্য হিসেবেও এর দাম অনেক।

তারা ফলের চারা, কলম ও বীজ বিক্রির জন্য নার্সারি তৈরি করেন। এই নার্সারি থেকে প্রতি বছরে ৭০—৮০ হাজার টাকা মুনাফা অর্জন করেন। ফলে রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ কম হয়। তাই আর্থিক ঝুঁকি কম থাকে।

এসবের ফলে রহিম দারিদ্র্য বিমোচনে সক্ষম হন এবং তার বন্ধুরাও বেকারত্ব দূরীকরণে সফল হন।

প্রশ্ন ▶ ২৫ রিপন মিয়া একজন সফল ফুল চাষি। তিনি সারা বছর ধারাবাহিকভাবে বাণিজ্যিকভিত্তিতে রজনীগন্ধা, ডালিয়া, গোলাপ, গ্লাডিওলাস ও গাঁদা ফুল চাষ করে আর্থিকভাবে বেশ লাভবান হয়েছেন। ফুল চাষের জমি, ফুলের পরিচর্যা, ফুল সংগ্রহ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা ঈর্ষনীয়।

◀ *শিখনফল-৭*

ক. চন্দ্রমল্লিকা ফুলের বংশবিস্তারের মাধ্যম কী? ১

খ. ডালিয়া ফুলের বংশবৃদ্ধির পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রিপন মিয়া উদ্দীপকের দ্বিতীয় ফুলের পরিচর্যা কীভাবে করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাণিজ্যিকভাবে ফুল চাষ করে রিপন মিয়ার আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চন্দ্রমল্লিকার বংশবিস্তারের মাধ্যম হচ্ছে সাকার।

খ ডালিয়া বীজ, কন্দ ও শাখা কলমের সাহায্যে বংশ বৃদ্ধি করে।

সিঙ্গেল জাতের ডালিয়ার ক্ষেত্রে বীজ থেকে চারা উৎপন্ন করা হয়। আবার পূর্ববর্তী বছরে সংগ্রহকৃত ও সংরক্ষিত কন্দ কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে রোপণ করা হয়। শাখা কলম তৈরির জন্য প্রতিটি শাখা কেটে কলম করতে হয়।

গ উদ্দীপকের ২য় ফুলটি হলো ডালিয়া।

রিপন মিয়া এক গাছ থেকে একাধিক ফুল উৎপাদন করতে চেয়েছিলেন। এজন্য চারা বড় হলে তিনি চারার মাথা কেটে দিয়েছিলেন। ফলে চারার মাথা হতে অনেক কুঁড়ি বের হয় ও প্রতিটি কুঁড়ি পরিণত হয়ে একটি করে ফুল উৎপাদন করে। তবে এভাবে মাথা কেটে দিলে ফুলের সংখ্যা বেশি হলেও ফুলের আকার ছোট হয়ে যায়। কিন্তু বড় আকারের ফুলের বাজার মূল্য বেশি। তাই তিনি কিছু চারার মাথা না কেটে পার্শ্বকুঁড়ি কেটে দিয়েছিলেন। গাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি প্রতি গাছে ১ কেজি পরিমাণ খৈল প্রয়োগ করেছিলেন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি সরবরাহ করেছিলেন। ফলে ফুলের আকার বড় হয়েছিল কিন্তু প্রতি গাছে মাত্র একটি ফুল ফুটেছিল। কুঁড়ি আসার পর তিনি নিয়মিত সেচ প্রদান করেছিলেন। এতে ফুলের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল ও আকার বড় হয়েছিল। এছাড়া তিনি কাঠি দিয়ে গাছ বেঁধে দিয়েছিলেন। কারণ ফুলের ভারে অনেক সময় গাছ নুয়ে পড়ে। তিনি গাছে কুঁড়ি আসার পর সার প্রয়োগ করেননি। গাছে ফুলের কুঁড়ি আসার পর সার প্রয়োগ করলে ফুলের উৎপাদন হ্রাস পায়। থ্রিপস ও জাব পোকা ডালিয়া ফুলের শত্রু। ডালিয়ার অ্যানথ্রাকনোজ ও ঢলে পড়া রোগ দেখা যায়। এসব সমস্যা সমাধানে তিনি বালাইনাশক ব্যবহার করেছিলেন। তিনি ফুল সংগ্রহের সময়ও সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন।

রিপন মিয়া উন্নত জাতের ডালিয়া সঠিক পদ্ধতিতে পরিচর্যা করেন বলে তিনি ফুল চাষে লাভবান হন।

ঘ রিপন মিয়া তার জমিতে বাণিজ্যিকভাবে ডালিয়া ফুল চাষ করেন এবং লাভবান হন।

ডালিয়া একটি শীতকালীন মৌসুমি ফুল। বর্ণ বৈচিত্র্যের জন্য এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এ ফুলের উৎপত্তিস্থল মেক্সিকো। তবে এর বৈচিত্র্যের জন্য এটি পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয় একটি ফুল।

ডালিয়া ফুল চাষ অত্যন্ত লাভজনক। বিভিন্ন উৎসবে ও অনুষ্ঠানে ফুলের চাহিদা ব্যাপক হওয়ায় দিনে দিনে এই ফুলের চাষ বাড়ছে। ফুল বিক্রি করে অল্প সময়ে অধিক লাভবান হওয়া যায় বলে আত্মকর্মসংস্থান ও নগদ আয়ের উৎস হিসেবে এই ফুল চাষ করা হয়। ফুলের নির্যাস থেকে পারফিউম, সেন্ট, আতর ইত্যাদি তৈরি হয়। ফলে নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ডালিয়া ফুল তার সৌন্দর্যের জন্য সারা বিশ্বে সমান জনপ্রিয়। তাই এই ফুল রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। অন্যদিকে বাংলাদেশের আবহাওয়া এ ফুল চাষের উপযোগী। ডালিয়া ফুল কন্দ ও মাথা কলমের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে বলে এ ফুল চাষে অধিক ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। ডালিয়া ফুলের পরিচর্যাও অনেক সহজ। এটি খুবই কম পোকামাড়ক ও রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে বালাইনাশকের জন্য অধিক ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। তাই উৎপাদন খরচ কম হয়।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, রিপন মিয়া কম খরচে ভালো মানের অধিক ডালিয়া ফুল উৎপাদন করায় এই ফুল বিক্রি করে তিনি অনেক লাভবান হন।

প্রশ্ন ▶ ২৬ ইমরান লেখাপড়া শেষ করে অনেক চেষ্টা করেও কোনো চাকরি পেল না। অবশেষে সে বাড়ির পাশে ১০ শতাংশ জমিতে ফুলের চাষ করল। সে বিভিন্ন ফুলের জাতের মধ্যে থেকে যে ফুলটি চাষ করে তা দেখতে চাঁদের মতো আর পাপড়ি হচ্ছে মল্লিকা ফুলের মতো। ফুল চাষ করে সে গ্রামের একজন আত্মনির্ভরশীল যুবক হিসেবে পরিচিত হলো। ◀ *শিখনফল-৭*

ক. ডালিয়া মোজাইক কী? ১
খ. চন্দ্রমল্লিকা ফুলকে শরতের রাণী বলা হয় কেন? ২
গ. ইমরান উক্ত ফুলের চাষ কীভাবে করল তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ইমরানের আত্মনির্ভরশীলতার সঙ্গে অর্থনৈতিক গুরুত্বে কী বিশেষ ভূমিকা রাখে— তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ডালিয়ার মোজাইক হলো ডালিয়ার এক ধরনের ভাইরাসঘটিত রোগ।

খ চন্দ্রমল্লিকা ফুলকে শরতের রাণী বলা হয়।
শীতকালীন মৌসুমি ফুলের মধ্যে চন্দ্রমল্লিকা রূপে ও সৌন্দর্যে অতুলনীয়। এ ফুল নানা বর্ণের ও আকৃতির হয়ে থাকে। নানা রংয়ের বাহার ও গঠনের জন্য একে শরতের রাণী বলা হয়।

গ উদ্দীপকের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায় ইমরান চন্দ্রমল্লিকা ফুলের চাষ করেছে।
চন্দ্রমল্লিকা ফুলের চাষের ক্ষেত্রে সে প্রথমে দোআঁশ ও পলি দোআঁশ মাটি নির্বাচন করেছিল। মাটির pH ৫.৫-৭.৫ এর মধ্যে ছিল। পরে সে ভালো জাত নির্বাচন করে। জমি সমতল করে তারপর সেখানে সে চাষ দেয়। জমিতে ৩-৪টি চাষ দেয় এবং পরে বিঘা প্রতি ২ টন গোবর ও ২০০ কেজি খৈল দেয়। পরে ৫০ কেজি টিএসপি ও পটাশ সার দেয়। এরপর চন্দ্রমল্লিকার বিভিন্ন রোগ দমনের জন্য মেনকোজেব ১.২ মিলি/লিটার পানিতে গুলে ২-৩ বার স্প্রে করে। আর মাকড় দমনে প্রোপারজাইট ২-৩ মিলি/লিটার পানিতে গুলে সপ্তাহে ২ বার স্প্রে করে। এরপর রোপণের ১১০-১৩০ দিনের মধ্যে ফুল সংগ্রহ করে। সে ভোর বেলা ও বিকেলে ফুল তোলে।
অতএব বলা যায়, উপরে বর্ণিত উপায়ে ইমরান চন্দ্রমল্লিকা চাষ করে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হয়।

ঘ ইমরান চাকরি না পেয়ে বাড়ির পাশে ১০ শতাংশ জমিতে চন্দ্রমল্লিকা ফুলের চাষ করল।
চন্দ্রমল্লিকা বিশ্বের জনপ্রিয় ফুলগুলোর মধ্যে অন্যতম। এর বিচিত্র বর্ণ, রূপ সব মিলিয়ে গোলাপের পরেই এর অবস্থান। এ ফুলের চাষে অন্যান্য ফুলের চেয়ে বেশি লাভ পাওয়া যায়। চন্দ্রমল্লিকা চাষে বিঘা প্রতি ৬০-৭০ হাজার টাকা লাভ হয় যা গাঁদা ও রজনীগন্ধা হতে অনেক বেশি। এছাড়া চন্দ্রমল্লিকা একই জমিতে সাথি ফসল হিসেবে লাগিয়ে বছরে ২-৩ বার ফুল তোলা সম্ভব।
চন্দ্রমল্লিকা চাষে উৎপাদন খরচ কম। এছাড়া এটি টবে ও অল্প জায়গায় চাষ করা যায়। অন্যান্য ফসলের তুলনায় রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়, পরিচর্যা কম লাগে। এ ফুল বর্তমানে বিদেশেও রপ্তানি করা হচ্ছে। সারা দেশে বিভিন্ন লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে এ ফুলের চাষের মাধ্যমে।
তাই বলা যায়, ইমরান এ ফুল চাষ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি ফুলটির অনেক অর্থনৈতিক গুরুত্বও রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ ফুল কে না ভালবাসেন। তাই তো কুমিল্লার একজন ফুলপ্রেমী ইদ্রিস মিয়া শখ করে তার নিজস্ব জমিতে বিভিন্ন মৌসুমি ফুলের চাষ করেন। এসব ফুলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রজনীগন্ধা, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গ্লাডিওলাস, গোলাপ, গাঁদা ইত্যাদি। 'আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা' থেকে তিনি ফুলের চাষ ও তার বহুমুখী ব্যবহারের ওপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। প্রশিক্ষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ব্যবসায়িক চিন্তাভাবনা শুরু করেন এবং পরিসর বড় করেন। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে ফুলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইদ্রিস মিয়া সীমিত পরিমাণে ফুল বিদেশে রপ্তানি করছেন। ◀ *শিখনফল-৭*

ক. স্যুটি মোল্ড কোন ছত্রাকের আক্রমণে হয়ে থাকে? ১
খ. বাংলাদেশে তুলা চাষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. ইদ্রিস মিয়া কীভাবে উক্ত ফসলের পরিচর্যা করেন?— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উল্লিখিত ফসল চাষ করে ইদ্রিস মিয়া যেভাবে সফল হলেন তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্যুটি মোল্ড *Mitteriella zizyphina* ছত্রাকের আক্রমণে হয়ে থাকে।

খ বাংলাদেশে সুতা ও কাপড়ের জন্য প্রয়োজনীয় তুলার প্রায় সবটাই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ইন্টারন্যাশনাল কটন অ্যাডভাইজার কমিটির পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০১৭-১৮ মৌসুমে বাংলাদেশে মোট ১৫ লাখ টন তুলার চাহিদা থাকতে পারে, যা চলতি মৌসুমের তুলনায় ৫% বেশি। আমাদের দেশে রবি ও খরিপ দু'মৌসুমেই তুলা চাষ করা যায়। এসব সম্ভাবনার কারণেই বাংলাদেশে তুলা চাষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ ইদ্রিস মিয়া বিভিন্ন ফুল চাষ করেছেন এবং ফুলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ফুল গাছের কিছু পরিচর্যা করেছিলেন।
ইদ্রিস মিয়া এক গাছ থেকে একাধিক ফুল উৎপাদন করতে চেয়েছিলেন। এজন্য চারা বড় হলে তিনি চারার মাথা কেটে দিয়েছিলেন। ফলে চারার মাথা হতে অনেক পার্শ্বকুঁড়ি বের হয় ও প্রতিটি কুঁড়ি পরিণত হয়ে একটি করে ফুল উৎপাদন করে। তবে এভাবে মাথা কেটে দিলে ফুলের সংখ্যা বেশি হলেও ফুলের আকার ছোট হয়ে যায়। কিন্তু বড় আকারের ফুলের বাজারমূল্য বেশি। তাই তিনি কিছু চারার মাথা না কেটে পার্শ্বকুঁড়ি কেটে দিয়েছিলেন। গাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি প্রতি গাছে ১ কেজি পরিমাণ খৈল প্রয়োগ করেছিলেন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি সরবরাহ করেছিলেন। ফলে ফুলের আকার বড় হয়েছিল। তিনি কুঁড়ি আসার পর নিয়মিত সেচ প্রদান করেছিলেন। এতে ফুলের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল ও আকার বড় হয়েছিল। এছাড়া তিনি কাঠি দিয়ে গাছ বেঁধে দিয়েছিলেন। কারণ ফুলের ভারে অনেক সময় গাছ নুয়ে পড়ে।
ইদ্রিস মিয়া গাছে কুঁড়ি আসার পর সার প্রয়োগ করেননি। ফুলে কুঁড়ি আসার পর সার প্রয়োগ করলে ফুলের উৎপাদন হ্রাস পায়। ফুলে বিভিন্ন পোকার আক্রমণ ও রোগ দেখা যায়। এসব সমস্যা সমাধানে তিনি বালাইনাশক ব্যবহার করেছিলেন। তিনি ফুল সংগ্রহের সময়ও সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন।
পরিশেষে বলা যায়, ইদ্রিস মিয়া সঠিক পদ্ধতিতে ফুলের পরিচর্যা করেন। এজন্য তিনি ফুল চাষে লাভবান হন।

ঘ উদ্দীপকের ইদ্রিস মিয়া ফুল চাষ করে সফল হন।

ফুল চাষে বাংলাদেশের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এ দেশের জমি ও আবহাওয়া ফুল চাষের উপযোগী। বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার সোসাইটির হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের ২৪টি জেলার প্রায় ১২ হাজার একর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে ফুল চাষ হচ্ছে। ফুল চাষ ও ব্যবসার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২০ লাখ মানুষ জড়িত। এক বিঘা জমিতে ধান চাষে লাভের পরিমাণ মাত্র ১৪-১৫ হাজার টাকা। অন্যদিকে, এক মৌসুমে এক বিঘা জমিতে গাঁদা ফুল চাষে নিট লাভ হয় ৩৫-৪০ হাজার টাকা, গ্লাডিওলাসে ৩০-৩৫ হাজার টাকা, রজনীগন্ধায় ৪০-৪৫ হাজার টাকা এবং চন্দ্রমল্লিকায় লাভ হয় ৬০-৭০ হাজার টাকা। গোলাপ ফুল চাষের ক্ষেত্রে ৩-৪ বছরে লাভ হয় ৩-৪ লাখ টাকা আর জারবেরা চাষে এই লাভের পরিমাণ ৩-৪ বছরে প্রায় ৯-১০ লাখ টাকা। বেশিরভাগ ফসলই বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়েই চাষ করা যায়। অন্যদিকে কিছু কিছু ফুল বছরের যেকোনো সময়ই চাষ করা যায়, যেমন- রজনীগন্ধা। বাংলাদেশে উৎপাদিত কাঁচা ফুল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কাঁচাফুল রপ্তানি করে আমাদের দেশে আয় হয় ১০০ কোটি টাকারও বেশি।

ইদ্রিস মিয়ার অনুকরণে দেশের বেকার যুবক-যুবতিরা ফুল চাষে এগিয়ে এলে নিজেদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দেশের রাজস্ব ও রপ্তানি আয় বাড়াতে সহায়ক হবে। অতএব বলা যায়, ইদ্রিস মিয়ার কর্মকাণ্ডটি উৎসাহ প্রদানকারী ও প্রশংসার দাবিদার।

প্রশ্ন ▶ ২৮ সুজন ডালিয়ার ডবল শ্রেণির জাতের বীজ বপন করে উৎপাদিত গাছে সিঙ্গেল শ্রেণির ফুল দেখে অসন্তুষ্ট হন। ফুল বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিলে তিনি অঙ্গজ উপায়ে চারা উৎপাদনের কথা বলেন। সুমন অঙ্গজ উপায়ে উৎপাদিত চারা থেকে ফুল চাষ করে সন্তুষ্ট হন। ◀ *শিখনফল-৭*

ক. বীজ কী? ১

খ. বীজ শোধন করার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ফুল বিশেষজ্ঞের পরামর্শে সুজন কীভাবে চারা উৎপাদন করেছিলেন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ফুল চাষ করে সুজনের অসন্তুষ্টির ও সন্তুষ্টির কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বীজ হলো ফলের নিষিক্ত ও পরিপক্ক ডিম্বক।

খ বীজ বপনের পূর্বে ছত্রাকনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করাকে বীজ শোধন বলে।

বপনকৃত বীজ ও উৎপন্ন চারাকে রোগের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বীজ শোধন করা প্রয়োজন। তাছাড়া যেসব ফসলের বীজত্বক শক্ত, সেসব ফসলের বীজ শোধন করে নিলে সুপ্তাবস্তা ভাঙার জন্য নির্ধারিত সময়ে অঙ্কুরোদগম ঘটে। অর্থাৎ, সুস্থ সবল চারা উৎপাদন, বীজবাহিত রোগ প্রতিরোধ, অঙ্কুরোদগম হার বৃদ্ধি ও ভালো ফলন পেতে বীজ শোধন করা হয়।

গ সুজন ফুল বিশেষজ্ঞের পরামর্শে অঙ্গজ পদ্ধতিতে ডালিয়া চারা উৎপাদন করেন, যাকে শাখা কলম বলা হয়।

শাখা কলম করার জন্য সুজন মূলজ কন্দে (সাকার) জন্মানো কচি চারা কেটে অথবা ভেঙে নেন। তাছাড়া তিনি পুষ্ট কন্দ কাণ্ডের পাশে জন্মানো ১৫—২০ সেমি লম্বা পুষ্ট শাখাও গিঁটসহ সংগ্রহ করেন। পরে তিনি শাখাগুলোকে বালি ভর্তি টবে/জমিতে পুঁতে হালকা সেচ দেন। শাখা রোপণের ১৫—২০ দিন পর শিকড় গজালে কলমগুলোকে সাবধানে তুলে পলিথিন ব্যাগের ৫০% গোবর মিশ্রিত মাটিতে লাগান। ৮—১০ দিন পর চারা সতেজ হয়ে উঠলে সুজন চারাগুলোকে নির্ধারিত জমিতে রোপণ করেন। আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ মাসে সুজন চারা উৎপাদন ও রোপণ করেন। শাখা কলম পদ্ধতিতে সুজন যে চারা উৎপাদন করেন তার গুণাগুণ হুবহু মাতৃউদ্ভিদের গুণাগুণ সম্পন্ন হয়। তাই সুজনের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত থাকে।

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে সুজন চারা উৎপাদন করে তার কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের চারা পেয়ে সন্তুষ্ট হন।

ঘ উদ্দীপকের সুজনের চাষকৃত ডাবল শ্রেণির জাতের ডালিয়া গাছে সিঙ্গেল শ্রেণির ফুল ফোটায় তিনি অসন্তুষ্ট হলেও কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে সমস্যার সমাধান হওয়ায় তার অসন্তুষ্টি দূর হয়।

সাধারণত ডালিয়া ফুলে বীজ থেকে উৎপাদিত চারায় মাতৃগাছের গুণাগুণ সমুন্নত থাকে না। অনেক সময় ডাবল শ্রেণির বীজে জন্মানো গাছে সিঙ্গেল শ্রেণির ফুল ফোটে ও ফুলের বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুজনের লাগানো চারাটিও হয়ত বীজ থেকে উৎপাদন করা হয়েছিল। যে কারণে এমনটি ঘটে এবং সুজন অসন্তুষ্ট হন।

পরবর্তীতে সুজন ফুলবিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতে অঙ্গজ উপায়ে চারা উৎপাদন করেন। অঙ্গজ উপায়ে উৎপাদিত চারায় মাতৃগুণ সংরক্ষিত থাকে বলে মাতৃগুণাগুণ সম্পন্ন চারা পাওয়া যায়। এ কারণে সুজন অঙ্গজ উপায়ে তৈরিকৃত চারা থেকে ডাবল শ্রেণির ফুল পেয়ে সন্তুষ্ট হলেন।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, চাহিদা অনুযায়ী ডালিয়া গাছ থেকে ফুল না পাওয়াই ছিল সুজনের অসন্তুষ্টির কারণ, যা পরবর্তীতে সঠিক উদ্যোগ নেওয়ায় সমাধান করতে পেরেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ২৯ শিক্ষক ক্লাসে আদার চাষ পদ্ধতি আলোচনা করছিলেন। তিনি উক্ত ফসলের উপযুক্ত জাত এবং চাষের জন্য নির্বাচিত জমির মাটির বৈশিষ্ট্য, জমি তৈরি ও রোপণের সময় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি ফসলটির বর্ষা মৌসুমের ছত্রাকজনিত একটি রোগ ও দমন পদ্ধতি আলোচনা করে ক্লাস সমাপ্ত করেন। ◀ *শিখনফল-৮*

ক. উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশে সয়াবিন কম চাষ হয় কেন? ২

গ. উল্লিখিত ফসলের চাষ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উল্লিখিত রোগ ও তার দমন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উদ্ভিদ তার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য মাটি, বায়ু ও পানি হতে যেসব পদার্থ শোষণ করে সেগুলোকে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান বলা হয়।

খ আমিষের উৎস এবং ভোজ্য তেল হিসেবে সয়াবিন এখন অনেক দেশেই একটি প্রধান ফসল।

সয়াবিন বীজে শতকরা ১৯-২২ ভাগ তেল থাকে। স্থানীয় ঘানি বা দেশে প্রচলিত এক্সপেলারে সয়াবিন থেকে তেল নিষ্কাশন সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং প্রচুর পরিমাণ বীজ। উন্নত বীজ এবং আমাদের দেশে তেল ফসল হিসেবে সয়াবিন অধিক জনপ্রিয় এবং তেল নিষ্কাশন ব্যয়সাধ্য বলে সয়াবিন তেমন চাষ হয় না।

গ উদ্দীপকে শিক্ষক আদার চাষ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। আদা চাষের জন্য সামান্য ছায়াযুক্ত উঁচু, বেলে দোআঁশ, বেলে ও এঁটেল দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। এই চাষে উন্নত জাতের উফশী আদা নির্বাচন করতে হয়। ৫-৬ টি চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে ও আগাছামুক্ত করে মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে আদা বপন করতে হয়। ১৫-২০ গ্রাম ওজনের কন্দ সারিতে বপন করতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০-৬০ সেমি ও সারিতে বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ২০ সেমি বজায় রাখতে হয়। বপনের সময় ৫ সেমি গভীরে কন্দ রোপণ করতে হয়। রোপণের ৭-১০ দিনের মধ্যে চারা গজায়। আদা চাষে গোবর, ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সার প্রয়োজন অনুপাতে ব্যবহার করতে হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী সেচের ব্যবস্থা এবং জমে থাকা পানি নিকাশ করা জরুরী। আগাছা ও পোকামাকড় দমনের ব্যবস্থাসহ পরিচর্যা হিসেবে আদার গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হয়। মধ্য ডিসেম্বর থেকে মধ্য জানুয়ারিতে আদা তুলে ও শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে আদা চাষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত রোগটি হলো আদার কন্দ পচা রোগ যা একটি ছত্রাকজনিত রোগ।

কন্দ পচা আদার একটি মারাত্মক রোগ। এটি মাটি ও বীজবাহিত রোগ। বৃষ্টিপাতজনিত রসালো মাটি ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এ রোগ দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। বর্ষাকালে গাছের উচ্চতা যখন ৪—৬ সেমি হয় তখন সাধারণত এ রোগের লক্ষণ বেশি প্রকাশ পায়। প্রথমে গাছের নিচের দিকে পাতার প্রান্তভাগে হালকা হলুদাভ লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং পত্রফলকের দিকে বিস্তার লাভ করে। পাতার মধ্যভাগ সবুজ থাকলেও পাতার কিনারায় ক্রমশ হলুদ হতে থাকে। এ রোগের আক্রমণে কন্দ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আদা ফসলের ক্ষেত সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে ফলন মারাত্মকভাবে কমে যায়।

এ রোগ দমনে পানি দাঁড়ায় না এমন জমি এবং উত্তম পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হয়। যে সমস্ত জমিতে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় সে সমস্ত জমি এড়িয়ে চলা ও রোগে আক্রান্ত জমিতে আদা লাগানো যাবে না। রোগ প্রতিরোধের জন্য রোগমুক্ত পুষ্ট বীজ কিংবা আদার কন্দ রোপণ করতে হবে। পচা থাকলে কন্দ ভেঙে ফেলে দিতে হবে। আক্রান্ত গাছ রাইজোমসহ সম্পূর্ণরূপে তুলে ধ্বংস করতে হবে। রোপণের পূর্বে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম রিডোমিল গোল্ড বা ১ গ্রাম ব্যাভিস্টিন মিশ্রিত দ্রবণে বীজ কন্দ ৩০ মিনিট ডুবিয়ে ছায়ার নিচে শুকিয়ে রোপণ করতে হবে।

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে আদার কন্দ পচা রোগ দমন করা যায় এবং ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করা যায়।

প্রশ্ন ▶৩০ বশির মিয়া তার বাড়ির একপাশে ফরিদপুরী, তাহেরপুরী, রুচি অরিয়েন্ট ইত্যাদি এবং অন্যপাশে জাপানিজ, বোল্ড জ্যামাইকা, কোচিন এবং আফ্রিকান জাতের মশলা চাষ করেন। ◀ *শিখনফল-৮*

ক. মালচিং কী? ১

খ. রসুন চাষে কীরূপ মাটির প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত এক পাশের মশলার চাষ পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অন্যপাশে চাষকৃত মশলার রোগবালাই ও পোকামাকড় দমনে কী ব্যবস্থা নিবে তা আলোচনা করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মালচিং হলো একটি কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি যার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণ করা হয়।

খ দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি রসুন চাষের জন্য উপযোগী তবে এঁটেল ও এঁটেল দোআঁশ মাটিতেও রসুন জন্মে।

জৈব পদার্থযুক্ত দোআঁশ মাটি রসুন চাষের জন্য উত্তম। মাটি উর্বর এবং সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাটির pH ৬-৭ হলে সেই মাটিতে রসুন চাষ সবচেয়ে ভালো হয়। বালি মাটিতে রসুন খুব একটা ভালো হয় না। উচ্চ ক্ষারীয় লবণাক্ত মাটি রসুনের জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বশির মিয়ার বাড়ির একপাশে পেঁয়াজের ফরিদপুরী, তাহেরপুরী, রুচি ওরিয়েন্ট ইত্যাদি জাত চাষ করেন।

পেঁয়াজের চাষের জন্য প্রথমে জৈব পদার্থপূর্ণ দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে। পেঁয়াজ চাষের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যেন তাপমাত্রা ১৫-৩০° সেলসিয়াস এবং আর্দ্রতা ৭৫% থাকে। এরপর পেঁয়াজের উচ্চফলনশীল জাত নির্বাচন করতে হবে। এরপর কন্দ বীজ নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বপণ করতে হবে এবং চারা ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে রোপণ করতে হবে। জমি তৈরির ক্ষেত্রে ৫-৬টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি আলগা ও ঝুরঝুরা করতে হবে। জমিতে সঠিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বপনের আগে ভিটাভেক্স বা প্রোভেক্স ২০০ দ্বারা শোধন করতে হবে। সঠিকভাবে বীজ বা চারা রোপণের পর সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর রোগ ও পোকা দমনের জন্য সঠিক কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। বপনের ৩-৪ মাস পর সঠিক পদ্ধতিতে পেঁয়াজ তুলে তা সংরক্ষণ করতে হবে।

উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিতে পেঁয়াজের চাষ করা সম্ভব। এতে হেক্টর প্রতি ১০-১২ টন ফলন পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বশির মিয়া বাড়ির অন্যপাশে জাপানিজ, বোল্ড জ্যামাইকা, কোচিন এবং আফ্রিকান জাতের আদা চাষ করেন।

আদায় বিভিন্ন ধরনের পোকার আক্রমণ ও রোগবালাইয়ের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আদায় প্রধানত পাতা মোড়ানো পোকা ও কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। পাতা মোড়ানো পোকার দমনে কার্বারিল ২.৩২ গ্রাম অথবা ডাইমেথোয়েট ২ মিলি/লি. পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে এবং কাণ্ড ছিদ্রকারী

পোকা দমনে সেভিন ডাস্ট ২% হারে ৭-১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

অন্যদিকে, আদার রোগবালাইয়ের মধ্যে পাতার দাগ পড়া রোগ, পাতা ঝলসানো রোগ ও কন্দ পচা রোগ অন্যতম। পাতার দাগ পড়া রোগ দমনে ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। পাতা ঝলসানো রোগ দমনে ২.৫ গ্রাম হারে ডাইথেন এম-৪৫ মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। কন্দ পচা রোগ দমনে পানি নিকাশ ও ম্যানকোজেব + মেটালক্সিল ২ গ্রাম বা কার্বেন্ডাজিম ১ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে কন্দ ৩০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে রোপণ করতে হবে। তবে রোগ দেখা দিলে কপার জাতীয় ছত্রাকনাশক ১৫-২০ দিন পরপর ২-৩ বার গোড়া ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। রোগ দেখা মাত্র ৩% রিডোমিল গোল্ড ১২ দিন পরপর জমিতে ড্রেনচিং করে দিলে দমন হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিতে আদার রোগ ও পোকামাকড় দমন করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৩১ মঈন তার জমিতে আদার চাষ করেন। তিনি জমি তৈরি থেকে শুরু করে সার প্রয়োগসহ সব ধাপেই অধিক যত্নবান ছিলেন। তারপরও তিনি লক্ষ করলেন, চারাগাছের নিচের দিকে পাতার প্রান্তভাগ হালকা হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে । এতে তিনি ক্ষতির আশঙ্কা করে দ্রুত একজন কৃষিবিদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। ◀ *শিখনফল-৯*

ক. আদার একটি স্থানীয় জাতের নাম লেখো। ১

খ. আদা একটি ঔষধি গুণসম্পন্ন ফসল– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মঈন তার জমিতে কী অনুপাতে সার প্রয়োগ করেছেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উল্লিখিত রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদার একটি স্থানীয় জাত হলো টেংগুরা।

খ আদায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ', যা রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে। তাছাড়া আদার ক্যালসিয়াম ও আয়রন দাঁতের ক্ষয়রোধ, হাড় গঠন ও রক্তশূন্যতা দূর করতে সাহায্য করে। আদা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে। তাই বলা যায়, আদা একটি ঔষধিগুণ সম্পন্ন ফসল।

গ মঈন তার জমিতে আদার চাষ করেন।

অন্যান্য ফসলের মতো আদা চাষের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট অনুপাতে জমিতে সার প্রয়োগ করতে হয়।

মঈন আদা চাষের জন্য হেক্টর প্রতি ১০ টন গোবর, ২২০ কেজি ইউরিয়া, ১৮০ কেজি টিএসপি এবং ২০০ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করেন। তিনি সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি ও অর্ধেক এমওপি সার (১০০ কেজি) জমি তৈরির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করেন। রোপণের ৫০ দিন পর তিনি অর্ধেক ইউরিয়া (১১০ কেজি) জমিতে প্রয়োগ করেন। অবশিষ্ট ইউরিয়া (১১০ কেজি) ও এমওপি (১০০ কেজি) সার সমান দুই ভাগ করে যথাক্রমে রোপনের ৯০ ও ১২০ দিন পর জমিতে উপরি প্রয়োগ করেন। প্রতি কিস্তিতে জমির আগাছা পরিষ্কার করে পরবর্তীতে সারির মাঝখানে সার প্রয়োগ করেন। ফলে সার সহজে মাটির সাথে মিশে যায়।

উপরিউক্ত অনুপাতে মাঈন তার জমিতে সার প্রয়োগ করেছেন।

ঘ মঈনের জমিতে ছত্রাকজনিত কন্দ পচা রোগ দেখা দেয়।

এ রোগের আক্রমণে কন্দ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আদা ফসলের ক্ষেত সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে ফলন মারাত্মকভাবে কমে যেতে পারে। এটি মাটি ও বীজবাহিত রোগ। রসালো মাটি ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ছত্রাক দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। তাই বৃষ্টিতে পানি জমে না এবং উত্তম পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাযুক্ত জমিতে আদা চাষ করতে হবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য রোগমুক্ত পুষ্ট আদার কন্দ রোপণ করতে হবে। রোপণের পূর্বে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম রিডোমিল গোল্ড বা ১ গ্রাম ব্যাভিস্টিন মিশ্রিত দ্রবনে কন্দ ৩০ মিনিট ডুবিয়ে ছায়ার নিচে শুকিয়ে রোপণ করতে হবে। এ রোগে আক্রান্ত হলে গাছ কন্দসহ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে আদার কন্দ পচা রোগ দমন করা যাবে।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৩২ রহমত আলী একদিন সকালে তার ধানক্ষেতে গিয়ে দেখতে পেল কিছু পোকা পাতার ভেতরে ছিদ্র করে সবুজ অংশ খেয়ে ফেলেছে। সে ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা করে স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তার নিকট গেল। তিনি বললেন তার জমিতে একটি পোকার আক্রমণ ঘটেছে যা কাঁটাযুক্ত। ◀ *শিখনফল-১*

ক. ধানের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ। ১

খ. ধানের বীজতলা কেন তৈরি করা যায়? ২

গ. রহমত আলীর জমিতে আক্রান্ত পোকার দমন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রহমত আলীর চাষকৃত ফসলটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪